অগুরু

অগুরু

—বার্ষিক সাহিত্য গ্রন্থ

শ্রীঅমিয় কু পাদিত

ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফাল্গুন—১৩৩৪

প্রকাশক—
শ্রীঅমলকৃষ্ণ মিত্র
ঘোষ মিত্র এণ্ড কোং,
১০।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম এক টাকা

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ।
আইডিয়াল প্রেস।
৮১।১ মস্‌জীদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—বিষয় সুচী—

ক্ষণিকের অতিথি

তোমারে চাহিয়াছিনু বাঁধিয়া রাখিতে
বন্দী করি এ বাহু-বন্ধনে
চপল-অঞ্চলা,
তুমি যে পারোনা কভু অচল থাকিতে
ধরণীর আনন্দ-নন্দনে
হে চির-চঞ্চলা.

একথা জানিত মন, তবু সব ভুলে
চেয়েছিনু তোমারে বাঁধিতে
অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে,
ভাবি নাই কোনোদিন জীবনের কূলে
একা মোরে হবে গো কাঁদিতে
তিতি-অশ্রুজলে !

তুমি চলে যাবে—এটা ভুলেও স্বপনে
কল্পনায় পারিনি আনিতে :
ছিল গো ধারণা—

ভালবাসিয়াছ যারে, কভু তার মনে
হেন বজ্র-বেদনা হানিতে
তুমি তো পারোনা।

সেদিন বুঝিনি আমি, তুমি এসেছিলে
ক্ষণিকের আনন্দ বহিয়া
লীলাভরে কত,

অনুরাগে নিমেষের তৃপ্তি শুধু দিলে
এ জীবনে জড়িত রহিয়া
প্রেয়সীর মত।

যাত্রী মোরা যুগে যুগে জীবনের পথে,
কোন্ তীর্থে নাহি জানি
ফুরাবে এ গতি,

ক্লান্তপদে বহুদূর চলি কোনমতে
ধরেছিনু তব পদ্মপাণি
ওগো আয়ুষ্মতী।

সেদিন চলার পথে শ্রান্তিটুকু মম
বহুযত্নে করেছিলে দূর
প্রাণপণে সেবি,

বলেছিলে কানে কানে 'প্রিয়—প্রিয়তম'
সুধা ঢেলে অধরে মধুর
কে তুমি গো দেবী?

তোমারে পাইয়া আমি ভেবেছিনু মনে
লভিয়াছি বুঝি এইবার
সাধনার ধন,

জন্ম-জন্ম যারে খুঁজি ফিরেছি ভুবনে
মিলিয়াছে আজি দেখা তার
সার্থক জীবন !

তোমারে রাখিব আমি সাধ ছিল চিতে
চিরদিন বেঁধে বাহু-ডোরে
গাঢ় অনুরাগে,

সেদিন কি জানিতাম এই ধরণীতে
কিছু নাহি রাখা যায় ধ'রে,
অসীম সোহাগে !

তুমি চলে গেছ আজ না বলিয়া কিছু
প্রাণ চায় তোমারে ফিরাতে
এ পথে আবার ;

জানি আমি মিছে এই ছোটা তব পিছু
অবিরাম দিবসে কি রাতে :
এনহে পাবার !

তবু যে বোঝেনা মন, অনুখন তাই!
আঁখিজলে যাপিতেছি কাল
পথ চেয়ে তব.

জীবনে পাথেয় যেগো কিছু আর নাই
শুধু আছে স্মৃতি-স্বপ্ন-জাল
নিতি নব নব !

আজ বুঝিয়াছি আমি, তুমি শুধু এসে—
অকাতরে ক'রে গেছ' দান
যাহা কিছু শ্রেয়,

এই ব্যর্থ অন্ধকার অন্তর প্রদেশে
অমৃতের দিয়েছ' সন্ধান
ত্রিলোকের প্রেয় !

জ্বেলে গেছ' দীপশিখা যে ভালবাসার
এ জীবনে ধ্রুব-তারা প্রায়
স্থির তাহা জানি,

পূর্ণ আজি প্রয়োজন তোমার আসার
চলে গেছ' তাই বুঝি হায়
হে মোর কল্যাণী !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মিলন।

(১)

"বাপ জান্, বাচ্চাকে একটু ধর্, আমি আস্ছি।"

ছয় বৎসরের বালক রহমৎ তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের সাহায্যে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী একবৎসরের বালিকাকে তাহার মসিকৃষ্ণ বুকের উপর তুলিয়া লইল। মেঘের কোলে বিদ্যুতের একটা স্থির রেখা কে যেন আঁকিয়া দিল।

বালক কত অর্থহীন কথা উচ্চারণ করিয়া শিশুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় রহমতের জননী একটি পেয়ালা ভরিয়া উষ্ণদুগ্ধ লইয়া তথায় ফিরিয়া আসিল।

রোরুদ্যমানা বালিকাকে কোলের উপর শোয়াইয়া দিয়া রহমৎ তখন তাল মান লয় হীন শিশুকণ্ঠের সঙ্গীতের দ্বারা তাহাকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

মাতা বলিল, "এই যে আমি এসেছি, খুকীকে আমার কাছে দে।"

বালক বলিল, "না মা, আমি ওকে দুধ খাইয়ে দেব।"

মাতা হাসিয়া বলিল, "দূর্ পাগল ছেলে, তুই পার্বিনে"

অনেক প্রকারে বুঝাইয়া পুত্রের ক্রোড় হইতে মাতা শিশুকে তুলিয়া লইল।

এই শিশু কন্যাটি ইরাকের নরপতি সর্দার মোয়াজিমের সন্তান। প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু ঘটায় সর্দার শিশুর পালনভার ধাত্রী রহমৎ-জননীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। রহমতের মাতার কিছুদিন পূর্ব্বে

একটি-কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার স্বামীও অল্পদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। সর্দ্দার মোয়াজিম এই ক্রীত-দাস দম্পতিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রহমতের মাতার বক্ষে দুগ্ধ-ধারা ছিল—তাঁহার মাতৃহারা কন্যা এই বিশ্বস্তা ক্রীতদাসী—ধাত্রীর পরিচর্য্যায় মানুষ হইয়া উঠিবে এ আশা মোয়াজিমের ছিল। শুদ্ধান্তঃ-পুরের একপ্রান্তে উদ্যান সমীপবর্ত্তী কতিপয় কক্ষে রহমৎ ও তাহার মাতা আশ্রয় পাইয়াছিল।

বালক রহমৎ, সর্দ্দার নন্দিনীকে সর্ব্বক্ষণ কোলে লইতে পারিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িত। তাহার সদ্যোজাতা ভগিনীর অকাল মৃত্যুর জন্য, রহমতের জাগ্রত ভ্রাতৃস্নেহ প্রভু কন্যার উপর চরিতার্থতা লাভ করিতেছিল। শিশুর নামকরণ হইয়াছিল রাবেয়া। রহমৎ একদণ্ডও রাবেয়াকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিত না। শৈশবের স্বপ্নস্বর্গে সে রাবেয়াকে রাণীর মত ভাবিয়া স্নেহ ও প্রীতির অর্ঘ্যে পূজা করিত।

(২)

বসন্তের প্রভাতে চারিদিক ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইউফ্রে-টিস্ ও টাইগ্রীস্ নদীর সঙ্গমস্থলের বিস্তীর্ণ—সীমাহীন জলরাশি দিকচক্র বালে মিলাইয়া গিয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী রাজোদ্যানে প্রকৃতির রঙ্গিণী মূর্ত্তি, মনোলোভা শোভা! সর্দ্দারের প্রাসাদশীর্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাসাদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণী টাইগ্রীস নদীর গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সর্দ্দারের সুদৃশ্য বজরা সোপানের একপার্শ্বে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্পভারাবনত একটি বৃক্ষের একটি শাখা নত করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর রহমৎ দশমবর্ষীয়া রাবেয়ার জন্য কিছু পুষ্পচয়ন করিতেছিল।

প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে বালিকা অদূরে দাঁড়াইয়া রহমতের কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিকটে তখন কেহই ছিলনা।

পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর হইলেও রহমতের দেহে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চার অভ্রান্ত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, কপাটবক্ষ তাহার নিকষকৃষ্ণ দেহের ঔজ্জ্বল্য ও শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সুখভোগলালিতা সর্দ্দার নন্দিনীর সুগৌর দেহেও বসরাই গোলাপের দীপ্তি ক্রমেই স্ফুটতর হইতেছিল।

সুন্দর একটি তোড়া বাঁধিয়া রহমৎ সসম্ভ্রমে উহা লইয়া রাবেয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবেয়া, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশৈশব সহচর, অনুগত ও ভক্ত রহমৎকে ভ্রাতৃজ্ঞানে স্নেহ করিত। তবে সে যে ইরাকের সর্দ্দারের কন্যা, আভিজাত্য, পদমর্য্যাদা এবং রূপগৌরব তাহার যে অসামান্য এই বোধশক্তি ধীরে ধীরে তাহার কিশোর মনের একপ্রান্তে যে সমুদিত হইতেছিল তাহা তাহার ব্যবহারে সময় সময় প্রকাশ না পাইত এমন নহে।

রহমতের প্রসৃত করপল্লব হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া রাবেয়া চঞ্চলচরণে উদ্যানপ্রান্তে ছুটিয়া গেল। রহমতও, প্রভুর অনুগামী বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় তাহার অনুগামী হইল।

প্রভাত আলোকের দীপ্তচ্ছটা তখন দিগন্তবিস্তৃত উচ্ছল জলরাশির উপর নৃত্য করিতেছিল। বালিকা দিকচক্রবালে মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "রহমৎ, ঐ যে জলের মধ্যে অনেক দূরে একটা কালো জিনিষ দেখা যাচ্ছে ওটা কি জান?"

রহমৎ বলিল, "ওটা একটা দ্বীপ।"

"ওখানে কি আছে?"

"শুনেছি কিছু নেই, শুধু [illegible] পাহাড়।"

"ওখানে মানুষ আছে ?"

"না, শাহজাদি, মানুষ জানোয়ার কিছুই ওখানে নেই।"

বালিকার কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না। সে তাহার চপল নয়নযুগল রহমতের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "ওখানে যাওয়া যায় না ?"

"যায়, নৌকো করে।"

বালিকা কয়েক মুহূর্ত্ত কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপের দিকে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া রহিল। জ্ঞান সঞ্চারের পর হইতে, উদ্যানে বেড়াইবার সময় কতবার ঐ সুদূরবর্ত্তী দ্বীপটিকে সে দেখিয়াছে,উহা কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে, কিন্তু খেলায় ভুলিয়া কাহাকেও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার মনে হয় নাই। আজ বসন্তপ্রভাতে, জলবিস্তারের মধ্যে দ্বীপটি- . ে কোন মায়ারাজ্যের একটা বিচিত্র পদার্থের ন্যায় মনে হইতেছিল।

"আচ্ছা রহমৎ, তুমি ওখানে কখন গিয়েছ ?"

"না, শাহজাদি। ওখানে যা'র তা'র যাবার হুকুম নেই। যে সর্দ্দারের বিষ নজরে পড়ে, রাজদ্রোহী হয়, তাকে ওখানে বন্দী করে রাখা হয়।"

বালিকা সবিস্ময়ে রহমতের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার কোমল হৃদয় দ্বীপটিকে আর অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "তবে ত ওটা বড় খারাপ জায়গা। না, আমি ওখানে যেতে চাইনে।"

রহমত মৃদু হাসিয়া বলিল, "শাহজাদির ওখানে যাবার ত কোন দরকার হবেনা। ও জায়গা দুষমনদের শাস্তির জন্য।"

শুষ্ক পত্র মর্ম্মরের শব্দে রহমৎ সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। স্বয়ং সর্দ্দার মোয়াজ্জিম্ খাঁ, এত সকালে এখানে! তিনি ত কোন দিনও এদিকে বেড়াইতে আসেন না!

সসম্ভ্রমে কিশোর রহমৎ সর্দ্দারকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। সর্দ্দারের পশ্চাতে ধাত্রী—রহমতের জননী।

নির্বিষ্ট দৃষ্টিতে রাবেয়া ও রহমতকে দেখিয়া সর্দ্দারের আসন ঈষৎ আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনেকদিন তিনি কন্যার কোন তত্ত্ব লইতে পারেন নাই। রাজকার্য্য এবং হারেমের আমোদ প্রমোদে সকল সময়েই তিনি বিব্রত থাকিতেন। মাতৃহারা বালিকা কন্যা ধাত্রীর দ্বারা উত্তম রূপেই লালিত পালিত হইতেছে এই বিশ্বাসের বশে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজ দেখিলেন, কন্যা ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই নারীত্বের মাধুর্য্য তাহার দেহে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এখন তাহাকে বাদশাজাদির ন্যায় শুদ্ধান্তঃপুরের কঠোর নিয়মাধীন রাখা প্রয়োজন। কোন্‌ও পুরুষের সাহার্য্য ইরাক সর্দ্দারের কন্যার পক্ষে আর এখন শোভন নহে।

ধাত্রীর দিকে ফিরিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাবেয়া তোমার প্রতিপালনগুণে ভালই আছে; কিন্তু এখন থেকে তাকে হারেমের মধ্যে রাখাই দরকার। এঅঞ্চল থেকে আজই তোমরা ভিতরের মহলে চলে যাবে। তোমার ছেলে রহমৎ কালথেকে দরবারে হাজিরা দেবে। তার শিক্ষার ভার আমার উপর। আমি তার জন্য আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেব। মাঝে মাঝে—যখন ইচ্ছা হবে—তুমি ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পাবে।"

কিশোর রহমৎ এই আদেশ শুনিয়া নতদৃষ্টিতে ভূমিপানে চাহিয়া রহিল।

(৩)

রহমৎ আর রাবেয়ার দেখা পায় না। জননীর নিকট সে শুনিতে পায় সর্দ্দার নন্দিনী এখন নৃত্যগীত ও নানাবিধ ললিতকলা শিক্ষা

করিতেছে। তাহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দিন দিন পরিপূর্ণতার পথে চলিয়াছে। রহমৎ তাহাতেই কতকটা তৃপ্তি পায়। কিন্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহাতে মিটে না, বরং বাড়িয়া চলে। দশবৎসর ধরিয়া সে যে সকল সময়ই তাহার অনুরক্ত সঙ্গী ছিল!

রহমতের অধ্যবসায় ছিল। মল্ল ও যুদ্ধবিদ্যা সে অল্পদিনের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শারীরিক বলে, অস্ত্রচালন কৌশলে এবং সাহসে সে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ বীরকেও অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশে যে দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা করা দূরে থাকুক, আশার বারিসেচে সে দুরাকাঙ্ক্ষার লতাটিকে সতেজ ও পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সর্দ্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া সে কোনদিন কি রাবেয়াকে লাভ করিতে পারিবে না?

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে তাহার অন্তরের এই গোপন আশার আভাস কাহাকেও জানিতে দেয় নাই—এমন কি তাহার জননীও কিছুই জানিত না।

উঃ! আজ দীর্ঘ সাতবৎসরের মধ্যে সে একবারও সেই লোকবিমোহিনী রাবেয়ার বরবপুর দর্শন পর্য্যন্ত পায় নাই। বাক্যালাপ ত দূরের কথা। তাহার কালো বুকের অন্তরালে রাবেয়ার জন্য যে প্রেম, যে স্নেহ, যে প্রীতি সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার পরিমাপ করিবে কে? যতই দিন যাইতেছিল, যতই রাবেয়া তাহার কাছে দুর্লভতর হইতে ছিল, তাহার প্রেম ততই গভীরতর অনুভূতিতে তাহার সমগ্রচিত্তকে পবিত্র ও সুন্দর করিয়া তুলিতে ছিল। তাহার দেহের প্রতি অস্থিতে রাবেয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সমগ্র অন্তর শুধু রাবেয়ার স্মৃতি সৌরভে আমোদিত।

সেদিন রাজ্যমধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের প্রবাহ বহিয়া গেল।

প্রজাগণ সন্ত্রস্ত এবং রাজসভা মন্ত্রণা ও আলোচনার বাক্যজালে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রহমৎ যথাসময়ে নিয়মিতভাবে দরবারে আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়াছিল। সর্দ্দার ইদানীং তাহাকে অন্যতম সেনানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্দ্দারের আগমনে সভাস্থল সহসা নিস্তব্ধ হইল। সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মোয়াজেম খাঁ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া—ললাট রেখাঙ্কিত।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সর্দ্দার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আজ আমার রাজ্য বিপন্ন। সকলেই শুনে থাক্‌বেন, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সর্দ্দার জিন্দা খাঁ সীমান্তপ্রদেশের ৬।৭খানা গ্রাম অধিকার করে রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ কর্‌ছে। তার আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য সেনাপতি রেজা খাঁ হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। সেনাপতি আহত, সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এই দুরন্ত দস্যুদলকে পরাজিত না কর্‌তে পারলে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে। আমি একজন সাহসী ও চতুর সেনানায়ককে এই কাজের ভার দিতে চাই। কিন্তু বেশী সৈন্য আমি দিতে পারব না। দেশের চারিদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনাদলকে ছড়িয়ে রাখ্‌তে হবে—রাজধানী রক্ষার জন্যও প্রচুর সৈনিক প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে কে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে দস্যুর বিরুদ্ধে যেতে চান?"

দস্যু সর্দ্দার জিন্দা খাঁর নাম সকলেই জানিত। এই প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুর নামে সমগ্র আরবদেশ কম্পিত হইত। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সেনাপতি রেজাখাঁর ন্যায় অমিততেজা ও রণকুশল সেনানায়কও যখন যুদ্ধে পরাজিত ও আহত, তখন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কে ধ্রুব মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে?

সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রচণ্ড নীরবতার যবনিকা কে যেন প্রসৃত করিয়া দিয়াছিল।

সর্দ্দার জানিতেন, জিন্দা খাঁর নাম শুনিলে কেহই সাহস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে স্বল্প সেনাবলসহ অভিযান করিতে চাহিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সীমান্ত প্রদেশে অধিক সৈন্য প্রেরণ করিবার সাহসও তাঁহার ছিলনা।

মোয়াজিম খাঁ কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "আজ এই দুশ্চিন্তার দায় হইতে আমাকে যে মুক্তি দিতে পারবে—এই পাপিষ্ঠ দস্যুকে পরাজিত করতে পারবে, তাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দান করব—সে যা চাইবে, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, তাই তাকে দেব।"

সেনাপতি ফৈজু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "বিশসহস্র সৈন্য হইলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, জাঁহাপনা।"

"অসম্ভব! এত অধিক সৈন্য এ সময়ে দেবার শক্তি আমার নাই। দশহাজার তুমি পাইতে পার।"

সেনাপতি আসন গ্রহণ করিলেন।

সভামধ্যে একটা গুঞ্জন শব্দ উত্থিত হইল; কিন্তু কোনও উৎসাহী বীরকে সর্দ্দারের সম্মুখে আর উত্থিত হইতে দেখা গেলনা।

মোয়াজিম খাঁ নৈরাশ্য ভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি দুর্ভাগ্য! ইরাক্ কি আজ বীর শূন্য?"

সভার প্রান্তদেশ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল," নিশ্চয় নহে। আপনি আদেশ করুন, জাঁহাপনা! আমি ৫ হাজার সৈন্য নিয়ে জিন্দা-খাঁকে আরবের মরুভূমি পার করে দিয়ে আসি।"

দরবার গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির বিস্মিত দৃষ্টি সেইদিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠদেহ বীর যুবক অবনতশীরে সর্দ্দারকে অভিবাদন করিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল, "দাস এখনই প্রস্তুত।"

ক্রীতদাসনন্দন রহমৎ খাঁকে অনেকেই চিনিত। তাহার প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি এবং অস্ত্রচালনা কৌশলের পরিচয় রাজধানীর কাহারও অগোচর ছিলনা; কিন্তু এই অসীম সাহসী যুবার দুরাকাঙ্ক্ষাকে তাহারা মনে মনে প্রশংসা করিতে পারিল না। ৫ হাজার সৈন্য লইয়া অমিত-পরাক্রম জিন্দা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান! এযে ধ্রুব মৃত্যুর সম্মুখে আত্মোৎ-সর্গ মাত্র।

মোয়াজিম খাঁ বিস্ময়বিহ্বল নয়নে মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তারপর স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "রহমৎ। তুমি যদি অসাধ্য সাধন করতে পার, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

সর্দ্দারের আদেশে যুবক সিংহাসন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ধীর, দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "জাঁহাপনার কৃপাদৃষ্টি বলে আমি দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারব!"

"তোমার প্রার্থিত পুরস্কার তখনই পাবে, রহমৎ।"

(৪)

রাজধানী উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রহমৎ—ক্রীতদাস নন্দন যুবক প্রকৃতই দুর্দ্ধর্ষ জিন্দা খাঁকে পরাজিত করিয়াছিল। দুইমাস ধরিয়া চেষ্টার পর একদিন সে এই শক্তিমান দস্যু সর্দ্দারকে একাকী পাইয়াছিল। রহমতের উদ্দেশ্য ছিল, অধিক সৈন্য ক্ষয় না করিয়া একবার যদি বীর জিন্দা খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে জানিত, এ পর্য্যন্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কেহই জিন্দাখাঁকে আহ্বান করিতে সাহস করে নাই।

কারণ দস্যু সর্দ্দারের দেহে অপরিমেয় শক্তি এবং তরবারী চালন-নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ ছিল।

একদিন কোনও বনপ্রান্তে রহমৎ জিন্দা খাঁকে দেখিতে পায়। তখন সেখানে জনপ্রাণী ছিলনা। কোনও ইরাণী সুন্দরীর নিকট হইতে পদব্রজে সে নিজ আস্তানার দিকে যাইতেছিল। রহমৎ সেনাদলকে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন ও নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ফকীরের ছদ্ম-বেশে জিন্দাখাঁর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অধিক সংখ্যক শত্রু হস্তে নিপতিত হইলে তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল তাহা সে জানিত, কিন্তু ভয় কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না। বর্ম্মাবৃত দেহের উপর ফকীরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনুসন্ধানের ফলে জিন্দা খাঁর প্রণয়িনীর গৃহ সে আবিষ্কার করে।

অরণ্য প্রান্তে বিশ্রামার্থ জিন্দাখাঁ যখন একটি বৃক্ষতলে বসিয়াছিল, রহমৎ তখন তাহার সমীপে উপস্থিত হয়। কথায় কথায় ফকিরবেশী রহমৎ জিন্দাখাঁকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে। দস্যু হইলেও বীরত্বের গর্ব্ব এবং অভিমান তাহার ছিল। সে তরুণবয়স্ক রহমতের অসমসাহসিকতা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল। সমগ্র আরব দেশের মধ্যে এমন কেহ ছিলনা যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায়।

কিন্তু অদৃষ্টলক্ষ্মী রহমতের প্রতি বিরূপ হয়েন নাই। জিন্দাখাঁ জানিত না যে, শারীরিক শক্তিতে আরব দেশে তাহার অপেক্ষাও শক্তি-শালী যুবক জন্ম গ্রহণ করিতে পারে, অস্ত্রচালন কৌশলে শুধু তাহারই একাধিপত্য নহে।

কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর জিন্দা খাঁ প্রাণ হারাইল। কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হওয়ায় রহমৎ সেনাদলের সাহায্যে জিন্দা খাঁর দস্যুদলকে সীমান্ত প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। জিন্দাখাঁই দস্যুদলের প্রাণশক্তি ছিল।

তাহার মৃত্যু সংবাদে তাহারা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

সর্দ্দার, রহমতের উল্লিখিত বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শত্রু দমন করিয়া রহমৎ যখন দরবার গৃহে প্রবেশ করিল, সর্দ্দারের আদেশে বীর যুবককে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করা হইল। রহমতের জয়ধ্বনিতে দরবার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সর্দ্দার তখন স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "রহমৎ, তুমি দেশের ইজ্জৎ,, শান্তি রক্ষা করেছ, শত্রুভয় থেকে প্রজাগণকে চিরমুক্তি দিয়েছ। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। কি পুরস্কার চাও বল।"

রহমৎ নীরবে, নত নেত্রে বসিয়া রহিল। প্রচুর রাজৈশ্বর্য্য, প্রভূত সম্মান, কিছুই সে চাহেনা। সে শুধু তাহার আশৈশবের ক্রীড়া সঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনী করিতে চাহে। ইহা হয়ত তাহার পক্ষে দুরাশা, কিন্তু সেই আশার বলেই সে অসাধ্য সাধন করিতে গিয়াছিল। রাবেয়ার প্রতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমই তাহার বক্ষে ও বাহুতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল, নহিলে জিন্দাখাঁর কাছে সে শিশু মাত্র।

"বল, রহমৎ, তুমি কি চাও? আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ—"

বাধা দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রহমৎ বলিল, "বান্দাকে অত লোভী মনে করবেন্ না, জাহাপনা। অর্থ বা ভূসম্পত্তির প্রতি অধমের কোন আকর্ষণ নেই।"

বিস্মিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্দ্দার বলিলেন, "তবে কি চাও তুমি বল?"

জিন্দাখাঁর সহিত যুদ্ধে যাহার বক্ষ স্পন্দিত হয় নাই আজ তাহার হৃদয় ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে অবশেষে সে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিল।

সর্দ্দারের আনন্দোজ্জ্বল আনন সহসা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রীতদাস-নন্দন রহমৎ কি সত্য সত্যই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে ? অথবা উহা তাঁহার উদ্ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা ?

সর্দ্দার-নন্দিনী—ইরাক্ নরপতির দুহিতা ক্রীতদাসের পত্নী হইবে ? ইহা অপেক্ষা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি হইতে পারে ? ক্রীতদাসের স্পর্দ্ধারও কি একটা সীমা নাই ?

প্রচণ্ড ক্রোধে মোয়াজেম্ খাঁ রুদ্ধবাক্ হইলেন। কিন্তু রহমৎ উপকারী বন্ধু। পুরস্কার দিতে তিনি প্রতিশ্রুত। তাই অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "দাস হয়ে যে প্রভু কন্যাকে প্রার্থনা করে সে শুধু অপরাধী নহে—রাজদ্রোহী। কিন্তু তোমার বীরত্বে আমি তুষ্ট, তুমি অন্য পুরস্কার চাও।"

রহমৎ যুক্তকরে বলিল, "অন্য কোন পুরস্কারের প্রার্থী আমি নই, জাঁহাপনা।"

তাহার বীর রক্ত ধমনিমধ্যে দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বরেও ঔদ্ধত্যের ঝঙ্কার অনুরণিত হইয়া থাকিবে।

সভাসদ্‌গণ তাহার স্পর্দ্ধায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "ইরাক সর্দ্দারের কন্যার পাণি প্রার্থনা ক্রীতদাসের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

শতকণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি হইল।

রহমতের উদ্গত ক্রোধ তাহার নয়নে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মানুষ, সে কর্ম্মী, সে বীর পুরুষ। তাহার আত্মসম্মানজ্ঞান তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ক্রীত-দাসত্ব কারও শরীরে লেখা থাকেনা।"

দীপ্তরোষে মোয়াজেম খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কুক্কুর, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা!—বিদ্রোহীটাকে যাবজ্জীবন দ্বীপে বন্ধ করে রাখবার হুকুম দিলাম। আমার উপকার করেছে বলে প্রাণ দণ্ড দেওয়া হলনা। প্রহরী একে নিয়ে যাও।"

সেনাপতির আদেশে রহমৎ তাহার কোষবদ্ধ তরবারী নীরবে সর্দ্দারের চরণতলে খুলিয়া রাখিল। নীরবে প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সে নির্ম্মম দণ্ডভোগ করিতে চলিল। রাবেয়া যখন চিরজন্মের মত তাহার কাছে দুর্লভ, তখন কারাগারের বন্ধনই তাহার কাছে শ্রেয়ঃ।

উন্নতশীর্ষে রহমৎ ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

(৫)

সীমাহীন জলবিস্তার—দূরে একদিকে শুধু ইরাক সর্দ্দারের শুভ্র প্রাসাদ ক্ষুদ্র খেলাগৃহের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। বৃক্ষলতাহীন, শুষ্ক, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপটি যেন জলমগ্ন দৈত্যের ন্যায় মাথা খাড়া করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছে। উহার গর্ভে একটি গুহামধ্যে অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণের একমাত্র অধিবাসী রহমৎ, সেই প্রাসাদের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

অপরাহ্নের আলো ক্রমে দিকে দিকে ম্লানরেখা টানিয়া দিয়া পশ্চিম সমুদ্রবেলায় ঢলিয়া পড়িতেছিল। বৈশাখের আকাশপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দূর হইতে একটি বিন্দুর মত দেখা যাইতেছিল, বায়ু স্তব্ধপ্রায়, জলবিস্তার নিস্তরঙ্গ—প্রকৃতি যেন ঝড় বেদনায় গুমরিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গুহামধ্যে বন্দী শৃঙ্খলিত নহে, মুক্ত। হিংস্র জলজন্তু-সমাকীর্ণ সে জলবিস্তার অতিক্রম করিয়া কোনও ব্যক্তি পলায়ন করিতে সমর্থ নহে মনে করিয়াই ইরাকের অধিপতি রহমৎকে গুহামধ্যে মুক্ত অবস্থায়

রাখিয়াছিলেন। অস্ত্রধারী সেনাদল সাহায্যে নৌকাযোগে সপ্তাহে দুইবার করিয়া দ্বীপমধ্যে তাহার জন্য আহার্য্য ও পানীয় প্রেরিত হইত।

দুইমাস এই জনশূন্য দ্বীপে রহমৎ নির্ব্বাসিত। জীবনে তাহার কোন মমতা ছিল না। ইচ্ছা করিলে যে কোনও দিন সে পলায়ন করিতে পারিত। হিংস্র জলজন্তুর ভয়ে তাহার অন্তর কোনও দিন কম্পিত হয় নাই। আবাল্য সন্তরণে তাহার প্রচণ্ড আনন্দ ছিল। ইরাকসর্দ্দার কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, দুইমাসের মধ্যে কতবার এই অসমসাহসিক যুবক সন্ধ্যাকালে—প্রাসাদ কক্ষে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিলে দ্বীপ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সলিল রাশি পার হইয়া তাহার জীবনান্দদায়িনীকে একবার দেখিবার আশায় পরপারে ভাসিয়া গিয়াছে, আবার ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জানিত, প্রাসাদের কোন্ কক্ষে রাবেয়া অবস্থান করে। সোপান শ্রেণীর ঠিক উপরের কক্ষেই তাহার আরাধ্যা দেবী বাস করিত। সেই কক্ষের অপর পার্শ্বে তাহার জননী থাকিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে সূক্ষ্মবিন্দুবৎ আলোকরশ্মি বহুদূর হইতে রহমতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিপথে পতিত হইত। অমনই অধীর আগ্রহে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তাহার বলিষ্ঠ বাহু সন্তরণে ক্লান্ত হইত না। প্রচণ্ড আগ্রহ যাবতীয় বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে পরপারে টানিয়া আনিত। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর সে একবারমাত্র চকিতবৎ বাতায়ন সমীপে সেই বরবর্ণিনীর দেখা পাইয়াছিল। তাহাতেই তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবী স্মরণাতীত যুগ হইতে আপন কেন্দ্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, ঠিক যেন সেই শক্তি রহমতকেও ইরাকের জলবায়ু এমন কি নির্জ্জন দ্বীপে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নহিলে কবে সে মোয়াজেম খাঁর রাজ্যসীমা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে পারিত।

না, সে ঐ প্রাসাদে—যেখানে তাহার শৈশবসঙ্গিনী, জীবনের একমাত্র আরাধ্যা দেবী বাস করিতেছে, সেই প্রাসাদপানে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া এই নির্ব্বাসিত জীবন পাত করিবে, কোথাও যাইবার—পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিবার তাহার কোন সাধ নাই। ইরাকের বাতাস রাবেয়ার দেহসুরভি বহন করিয়া পবিত্র, যে প্রাসাদে সে বাস করিতেছে, তাহার পাদমূল চুম্বন করিয়া তরঙ্গরাশি এই শৈলমূলে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে, ইহাদের মধ্য দিয়াই সে রাবেয়ার রূপ, গন্ধ, স্পর্শের রস কি অনুভব করিতে পারিতেছে না? না, এখানেই তাহার চির-নির্ব্বাসিত জীবন শেষ হইয়া যাউক।

কিন্তু আজ রক্ষিগণের মুখে সে যে সংবাদ শুনিয়াছে তাহাতে, এতদিন সে যে আশ্বাসে বাঁচিয়াছিল, তাহাও ত চূর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দার-নন্দিনীর আজ বিবাহ—পারস্যের উপকূলবর্ত্তী কোনও জনপদের রাজকুমার চিরদিনের জন্য রাবেয়াকে জীবনসঙ্গিনী করিতে আসিয়াছে। আজ রজনীতে রাজধানী উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিবে। কাল প্রভাতে রাবেয়া সুন্দরী স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে—তখন প্রাণহীন আশাশূন্য আনন্দ-বঞ্চিত এই ইরাকে রহমতের অবস্থিতির সার্থকতা কোথায়?

যুবক স্থির দৃষ্টিতে তটাভিমুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, বিশাল বক্ষোদেশ আন্দোলিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত বেদনাকে প্রকাশ করিতেছিল।

ঘনান্ধকারে জল ও স্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল! রহমৎ দেখিল, তীরভূমি আলোক-রেখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয় প্রাসাদ ও রাজধানী আজ মহানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। রহমৎ! রহমৎ! আজ তোমার ইহলোকের সকল সাধ, সব আনন্দের সমাধি!

স্তব্ধভাবে যুবক সেই আলোকমালার পানে চাহিয়া রহিল।

রাবেয়া এ বিবাহে কি সুখী? না হইবে কেন? অভিজাত দেশের রাজপুত্র আজ হইতে তাহার জীবনপথের চিরসঙ্গী। অর্থ, রূপ, সম্মান যাহাদের অদৃষ্টে বিধাতা পূর্ণমাত্রায় মাপিয়া রাখিয়াছেন, সুখ তাহাদের অফুরন্ত, আনন্দ তাহাদের অবিনশ্বর।

সেই ভাল, সেই ভাল। রাবেয়া যদি সুখী হয়, তাহার সুন্দর আননে যদি তৃপ্তির মাধুর্য্যধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই রহমৎ কৃতার্থ। ভালবাসার পাত্রের সুখ ও আনন্দে যে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারে, তাহার মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ।

কিন্তু একবার—শেষবারের জন্য সে কি তাহার আবাল্য সঙ্গিনীর হাসিমুখ—দয়িত লাভের আনন্দে কেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিতে পাইবে না?

ধীরে ধীরে যুবক গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ও কি। আকাশ যে কালো মেঘে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে! দামিনীর প্রচণ্ড দীপ্ত হাস্যরেখা যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে করিতে সীমাহীন আকাশের বুকে নৃত্য করিয়া গেল।

দূরে—বহুদূরে আলোক দীপ্তির তরঙ্গ তুলিয়া কাহারা যেন তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। কটিদেশের বস্ত্রবন্ধনী দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া অসমসাহসী যুবক শৈলদেহ বাহিয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগিল। কালোজলে তরঙ্গ তুলিয়া বারিরাশি ও কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে?

রহমৎ দৃঢ়সংকল্পে সলিলমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর তীরস্থ আলোকমালার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, বারিরাশি মথিত করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল।

শোঁ শোঁ শব্দে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঝটিকার কৃষ্ণজটাজাল বারিবিস্তারের উপর দিয়া যেন মৃত্যুর বার্ত্তা লইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কড় কড় শব্দে আকাশে অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল। অকস্মাৎ দৈত্যের ন্যায় সহস্র বাহু উত্থিত করিয়া ভীমকান্ত তরঙ্গদল রহমতের দিকে অট্টহাস্যে ছুটিয়া চলিল। রহমৎ স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

প্রভাত-অরুণকিরণে প্রকৃতি হাসিতেছিল। গতরজনীর দুর্য্যোগের কোনও চিহ্ন আকাশে বা বাতাসে ছিল না।

তিন চারিখানি সুদৃশ্য বজরা পুষ্পমাল্য ও পতাকায় সুশোভিত হইয়া সোপান শ্রেণীর পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। দেশীয় আচার অনুসারে নবদম্পতি বজরায় চড়িয়া জল বিহারে যাইবে।

নবপরিণীতা রাজকন্যা রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া প্রথম বজরায় আরোহণ করিবার জন্য সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিতেছিল। নানা আভরণে সুশোভিতা সঙ্গিনীগণ পশ্চাতে কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। রাজকন্যা সর্ব্বাগ্রে বজরায় আরোহণ করিলে সকলে তাহার অনুগামিনী হইবে। সর্দ্দার মোয়াজেম খাঁ সকলের পশ্চাতে জামাতার সঙ্গে আসিতেছিলেন।

বজরার মাঝিমাল্লা ও রক্ষকগণ সসম্ভ্রমে সেই শোভাযাত্রার দিকে চাহিয়া ছিল। রাজকন্যা সর্ব্বনিম্ন সোপানের কাছে দাঁড়াইতেই প্রথম বজরাখানি সন্মুখদিকে সরিয়া আসিল। একটি মখমলমণ্ডিত দারুনির্ম্মিত আরোহণী বজরা হইতে প্রস্তরমণ্ডিত সোপানশ্রেণীর উপর নামাইয়া দেওয়া হইল।

রাজকন্যা চঞ্চল চরণে আরোহণীর উপর উঠিলেন। সম্ভবতঃ

আরোহণী সুবিন্যস্ত হয় নাই, উহার উপর দাঁড়াইবা মাত্র সহসা উহা একপার্শ্বে সরিয়া গেল।

সুন্দরীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত বিস্ময় ও আতঙ্কের চাপা শব্দ হইবামাত্র সঙ্গিনীরা চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল।...না, রাজকুমারীর অঙ্গে কোনও বিশেষ আঘাত লাগে নাই; কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, একটা অর্দ্ধনগ্ন মৃতদেহ বজরা ও সোপানশ্রেণীর মধ্যে ভাসিতেছে। রাজকুমারীর কোমল চরণযুগল শবদেহ স্পর্শ করিয়াছিল।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাবেয়া উপরের সোপানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মৃত দেহটা কোথা হইতে আসিল? গোলমাল শুনিয়া মোয়াজেম খাঁ ঘটনাস্থলে আসিলেন। তাঁহার আদেশে মৃতদেহ তীরে তোলা হইল।

বৃদ্ধা ধাত্রী রহমতের জননীও রাবেয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেও ব্যাপার দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। মোয়াজেম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই বিবর্ণ, বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ধাত্রী দুইহস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মর্ম্মভেদী স্বরে বাহির হইল—"বাপজান!"

মিলন রজনীর প্রভাতে শৈশব সঙ্গীর প্রাণহীন দেহস্পর্শে রাবেয়ার সুন্দর গোলাপী আননে কি মৃত্যুর বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল?

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

—

চিঠির চটী

কুমুদ গল্প এবং কবিতা লিখে তরুণ সাহিত্যিক দলে বেশ একটু পসার জমিয়ে তুলেছিলো। বন্ধু মহলে তার খ্যাতি ছিলো এবং সম্পাদক মহলেও তার নাম নিয়ে আলোচনা চল্‌তো ও মধ্যে মধ্যে দু এক জনের কাছ থেকে লেখার তাগিদ এসে তা'কে আরো গর্ব্বিত ক'রে তুল্‌তো।

কুমুদের চেহারা মন্দ ছিলো না। ছিপ ছিপে গড়ন, মাথায় বড় বড় চুল পারিপাট্যে কুঞ্চিত। চোখে চশমা, নাকি স্বরে চিবিয়ে চিবিয়ে কোমল কর্‌বার বৃথা চেষ্টায় পৌরুষ বর্জ্জিত কথা ইত্যাদি যতো প্রকার গুণ লেখক ও কবি হ'তে হ'লে প্রয়োজন, তা'র প্রায় সবই ছিলো। আর যা না ছিলো তা' সে কষ্ট ও যত্নে আয়ত্ত করেছিলো। একটু খেয়ালীও ছিলো, মনটা ছিলো ভারী হাল্‌কা। একবার কিছু তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার্‌লে পরে সহজে আর তা'কে তা থেকে ফেরানো যেতো না।

যৌবন-বসন্তের হিল্লোল ও ঈশ্বর-দত্ত এই লেখবার ক্ষমতা তা'কে একেবারে ভাব-রাজত্বের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলো। সেই জন্যে সে সব সময় নানা কাল্পনিক স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাক্‌তো। নিজের চারি পাশের সমস্ত কিছুকে কবিত্বের ছন্দ-বন্ধের ভিতর দিয়ে দেখাই ছিলো তার কাজ এবং সমস্ত জিনিষের ভিতরই সে রোমান্স খুঁজে বেড়াতো। এর উপর সে বেশী রকম ভাবপ্রবণ ছিলো।

ছোট্ট একটি ঘরে একলা থাক্‌তো। জান্‌লা দিয়ে সীমাহীন অনন্ত আকাশ তা'র চোখে পড়্‌তো ও মনে নানা ভাব জাগিয়ে তুল্‌তো। জ্যোৎস্না রাতে জান্‌লা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে প্রেয়সীর মতো তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌তো। বর্ষা রাতে কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতবালার নৃত্য চ্যুত স্বর্ণ মেখলার অপূর্ব্ব জৌলুষ তা'কে বিস্ময়-মুগ্ধ ক'রে তুল্‌তো। বর্ষা ধারা নিশীথ রাত্রে যখন চিরন্তন বিরহ বেদনার ক্রন্দন গীত গাইতো. সে তখন ব'সে ব'সে নিজের মানসীর কাল্পনিক বিরহের কবিতা লিখ্‌তো। এমনি ক'রেই ভাব-খেয়ালে মশ্‌গুল হ'য়ে তার দিন কাট্‌ছিলো।

সে অবিবাহিত। বিয়ে কর্‌লে হয়তো কর্‌তে পার্‌তো কিন্তু বিবাহ যে নিছক সামাজিক বা লোকাচার ঘটিত ব্যাপার নয়, সেটার মধ্যে দিয়ে যে একটা চিরন্তনী প্রেমের ধারা ব'য়ে আস্‌ছে, তার ভিতর রোমান্স ভরা এবং প্রেম ও রোমান্স না থাক্‌লে যে, বিবাহ বিবাহই নয়. এই ধারণা তা'র বদ্ধমূল ছিলো ব'লে সে এতোদিন বিয়ে করেনি। তা'র মানসীকেই প্রেম, বিরহ, মিলন দিয়ে অভিনন্দিত কর্‌তো।

একদিন তা'র বন্ধু ভূতনাথ তা'কে খ্যাপাবার জন্যে বল্‌লে—হ্যাঁরে, এতো লিখ্‌ছিস্ কই কোনো মানসী তো তোর মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তোকে ধরা দিলে না। তোর লেখা প'ড়ে কোনো মানসী কিছু জবাব পাঠিয়েছে ?

এই কথায় কুমুদের মনে ধাক্কা লাগ্‌লো। সত্যই তো এতো দিন এ সম্বন্ধে তা'র মনে তো কিছুই হয়নি। এতো লেখা সব বৃথা হয়েছে। হয়তো এই লেখার ফাঁদেই মানসী ধরা পড়্‌তো। মনটা মুশড়ে গেলো. হতাশ ভাবে উত্তর কর্‌লে—কই, কেউতো কিছু লেখেনি, আর আমি ঠিকানা কাউকে জানাই নি, কাজেই কোনো জবাব পাইনি। মনে ধিক্'র এলো—সে মানসীকেই হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

আর এক বন্ধু প্রবোধ তা'কে হতাশ ক'রে দিয়ে বল্‌লে—আরে ছ্যা, আসল জিনিষেই ভুল। লেখার আসল উদ্দেশ্য যা তাই তুই অবহেলা করেছিস্‌। আর মানসী মানসী ক'রে হাওয়া হাতড়ে বেড়াচ্ছিস্‌। তুই একটা প্রকাণ্ড গাধা। আরে মানসী কাল্পনিক হ'লেও তা'কে চেষ্টায় বাস্তব ও সজীব ক'রে তুল্‌তে হবে। তবেই তো আসল রোমান্স।

কুমুদের মনে হ'লো সত্যিই তো। মানসী তো আর আপনি মূর্ত্তি ধ'রে আসে না এবং কোনো কবিকেই সে নিজে দেখা দেয়নি যতক্ষণ না তা'রা চেষ্টা ক'রে কল্পনার সোণার কাঠির স্পর্শে সজীব করে তুলেছে। আর এই সজীব করার জন্যে চাই প্রাণপাত সাধনা ও চেষ্টা।

সেইদিন হ'তে কুমুদ তার প্রাণের সমস্ত আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে, সঞ্চিত বিরহকে, ছন্দে বেঁধে দিকে দিকে মানসপ্রেয়সীর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিতে লাগ্‌লো। নানা উপায়ে ও কৌশলে গল্পের ভিতর নিজের ঠিকানা চালাতে লাগ্‌লো। আর সেই দিন হ'তে উৎসুক হ'য়ে ডাকের প্রত্যাশায় ব'সে থাক্‌তে লাগ্‌লো। মনে আশা, আজ নিশ্চয় কোনো না কোনো উত্তর আস্‌বে,—কোনো মানসী চিঠির বুকে তা'র বিরহ-বেদনা জানাবে।

কিন্তু প্রতিদিন নিরাশার মধ্যে দিয়ে কাটলেও মনে তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে ছিলো যে, একদিন না একদিন সে মানসীর লিপি পাবে।

সেদিন সকালে সে ঘরে ব'সে লিখছে, এমন সময় ভূতনাথ ও প্রবোধ এসে তা'র সাম্‌নে একখানা মাসিক পত্র ফেলে দিয়ে বল্‌লে এই দেখ্‌, প্রভাতী তোর বিরহ বেদনার সান্ত্বনালিপি বুকে ক'রে এসেছে। লেখিকা—চিত্র সেনা।

কুমুদ আশা-কম্পান্বিত বুকে একদমে সমস্ত লেখাটা প'ড়ে গেলো।

সমস্ত মুখে চোখে অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ-শিহরণ তড়িৎ বেগে ব'য়ে গেলো। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হ'লো না।

প্রবোধ বল্‌লে—দেখ, তুই এর পাল্টা জবাব লেখ্। একবার যখন জবাব দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই আবার দেবে।

কুমুদ আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বল্‌লে—নিশ্চয়ই। আজই আমি লিখবো।

কুমুদ জবাব লিখে লুকিয়ে গিয়ে প্রভাতীতে দিয়ে এলো এবং প্রভাতীর গ্রাহক ভুক্ত হ'য়ে এলো, প্রভাতীতে লেখা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, যখন চিত্র সেনা প্রভাতীতে উত্তর দিয়েছে তখন প্রভাতী সে নিশ্চয়ই পড়ে। অন্য কাগজে দিলে যদি কুমুদের লেখা তা'র চোখ এড়িয়ে যায় এই জন্যেই প্রভাতীতে লেখা দিলে। প্রভাতী আপিস থেকে চিত্র সেনার ঠিকানাটা জেনে নেবার ভারী ইচ্ছে হ'লো। কিন্তু তখনি তা'র মনে হ'লো—না, ছি, এরা তা'হলে মনে করবে কি! আগে ভালো ক'রে পরিচয় হোক তা'র পর ঠিকানাটা জেনে নিলেই হবে।

সেইদিন থেকে প্রভাতী কুমুদ ও চিত্রসেনার উত্তর প্রত্যুত্তর বুকে ক'রে যথাক্রমে বের হতে লাগলো। কুমুদের দিনগুলো আনন্দ দোলায় দোল খেয়ে কেটে যেতে লাগ্‌লো। কুমুদ আনন্দে মাতাল হ'য়ে উঠ্‌লো। তা'র মনে হ'লো এত দিনের সাধনা আজ সফল হয়েছে। মানস লক্ষ্মী তা'র পূজা গ্রহণ করেছেন।

* * * *

এই লেখার মধ্যে দিয়েই কুমুদ চিত্রসেনার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌লো। অথচ চাক্ষুষ দেখ্‌তে না পাওয়ায় তা'র মন বেদনাতুর হ'য়ে উঠ্‌লো। কতোদিন মনে ক'রেছে প্রভাতী আপিস থেকে ঠিকানা জেনে আস্‌বে, অথচ লজ্জায় তা' পারেনি! একবার ভাব্‌লে

হয়তো প্রবোধ ভূতনাথ জানে। কিন্তু তাদের কাছেও জিজ্ঞাসা কর্‌তে লজ্জায় কণ্ঠরোধ হ'য়ে গেলো। তা'র মনে হ'লো এই রকম পাওয়ার চেয়ে যে না-পাওয়া ঢের ভালো ছিলো। অন্তরের সব আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে অথচ তা মানসীকে নিবেদন কর্‌তে পার্‌ছে না। অনেক ভেবে সে পাওয়ার ভিতর না-পাওয়ার বেদনাকে ছন্দে বেঁধে কবিতা লিখলে। এই তা'র শেষ চেষ্টা। এইবার পেলে তো পেলে, নয়তো লেখাই ছেড়ে দেবে।

এবার তার আশা কতক পরিমাণে সফল হ'লো।

সকালের ডাকেই কুমুদের নামে একখানা চিঠি এলো—মেয়েলী হাতের ঠিকানা লেখা। চিঠিখানা পেয়ে তা'র বুক কেঁপে উঠলো—আশা ও আনন্দের সাফল্যে। চিঠিখানা খুলে পড়্‌তে সাহস হ'লো না। কে জানে এই লিপির বুকে কি আছে—বিষ কি অমৃত। পরে নিজেকে সংযত ক'রে চিঠি খুল্‌লে। লেখা খুব সাধারণ কিন্তু তা'তেই কুমুদের অন্তর নেচে উঠলো! চিঠিতে লেখা—

মহাশয়,

অনেকদিন হ'তেই আপনার লেখা পড়্‌ছি। শুধু পড়্‌ছি বল্‌লেই যথেষ্ট বলা হয় না, অতি আগ্রহের সঙ্গে পড়্‌ছি এবং প'ড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তারপর যেদিন জান্‌লাম যে, আপনিও আমার লেখা পড়েছেন, সেদিন নিজেকে ধন্য মনে কর্‌লাম। সেইদিন থেকে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা প্রবল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু জানেন তো, আমরা স্বভাবতঃ লাজুক। নিজেরা এগিয়ে প্রথমে কোনো কাজ কর্‌তে পারিনা। শেষে কিন্তু সে লজ্জার বাঁধ রাখ্‌তে পার্‌লাম না—আপনাকে পত্র লিখে হয়তো বিরক্ত কর্‌লাম। প্রগল্‌ভাকে ক্ষমা কর্‌বেন। পুনরায় আপনার লেখা পড়্‌বার জন্যে উৎসুক হ'য়ে রইলাম।

আপনার গুণমুগ্ধা—চিত্রসেনা রায়।

এই ছোট্ট চিঠিখানির ভিতর কুমুদ চিত্রসেনার হৃদয়ের অনেকখানিই যেনো দেখতে পেলে। স্পষ্টই বুঝতে পারলে চিত্রসেনাও তার প্রতি অনুরাগিনী, নইলে এমন উপযাচিকা হয়ে পত্র লেখে! আজ ভা-রী আনন্দ হ'লো তার। যে অজানা মানসীকে এতদিন হৃদয়ের সমস্ত প্রেম উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়ে এসেছে, আজ সেই মানসী মূর্ত্তিমতী হ'য়ে তা'র অঞ্জলি গ্রহণ করতে এসেছে। কয়জন লেখকের ভাগ্যে এতোটা গৌরব হয়! তার সমকর্ম্মীরা দেখুক। তা'রা দেখুক যে, সে শুধু লেখক নয়, প্রেমিক, সাধক—প্রেমকে সজীব ক'রে মূর্ত্তি দিতে পারে।

কুমুদের চিঠি পেয়ে এক ভাবনা হ'লো যে, চিঠিতে তো চিত্রসেনা ঠিকানা দেয়নি, অথচ সে কুমুদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকবে। সে কেমন করে উত্তর দেবে। নিশ্চয় চিত্রসেনা ভুল করেছে। কিন্তু এ ভুল যে কি মারাত্মক তা' বুঝলে সে নিশ্চয় করতো না। এবার যা থাকে কপালে প্রভাতী আপিস থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আসবে। তারা যাই মনে করুক সে ঠিকানা আনবে—মানস লক্ষ্মীকে কাছে পেয়ে লজ্জার জলে বিসর্জ্জন দিতে পারবেনা, তা'কে পূজা করবে। সে চিঠি লিখে ঠিকানা আনবে মতলব করে চিঠি লিখতে ব'সে গেলো।

আজ কুমুদের প্রেমের আবেগ পরিপূর্ণ জোয়ারের মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। চিঠির বুকে তা'র হৃদয়ের এতো দিনের সঞ্চিত প্রেমকে মুক্ত ক'রে দিলে। প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়ে চিঠিখানিকে সজীব ক'রে তুললে। দিনের পর দিন তার প্রেমাতুর হৃদয়ের মধ্যে যে বিরহ বেদনা সঞ্চিত হ'য়েছিলো, সেই বেদনা আজ পাওয়ার আনন্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে উপশম হ'য়ে গেলো।

চিঠি লেখা শেষ হ'লে কুমুদের মনে আবার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো যে, প্রভাতী আপিসে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবে কি না। কিছু ঠিক করতে না

পেরে ভাবলে যে, চিত্রসেনা যখন একবার চিঠি দিয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার উত্তর না পেলে আবার চিঠি দেবে। সে চিঠিতে ঠিকানা নিশ্চয়ই থাক্‌বে। বার বার একই ভুল হবে না নিশ্চয়ই। চিঠিখানা তুলে রেখে দিলে এবং সেই দিন হ'তে প্রতিদিন চিঠির প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাক্‌তে লাগ্‌লো।

এই রকম উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে দিন পোনেরো কেটে গেলো। এই দিন পোনেরো যে তার কি করে কাটলো তা এক পরমেশ্বর জানেন। মনের ভিতর আশা ও নিরাশার লড়াই চলেছে। কখনো আশার জয় হয়েছে, পরক্ষণে নিরাশা তা'র সেই জয়-গৌরবকে ক্ষুণ্ন ক'রে দিয়েছে।

কুমুদের মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন আবার একখানা চিঠি এলো। চিঠিখানি পরম আবেগভরে খুল্‌লে। খুল্‌তেই চিঠির ভিতরকার একটুখানি বিশেষত্বে তার মন নেচে উঠ্‌লো। সে বিশেষত্ব-টুকু আর কিছুই নয়—চিঠি খানির সম্বোধন। প্রথমে 'প্রিয়তম' লিখে পরে সেটি কেটে 'পূজনীয়' লেখা। প্রথম চিঠিতে লেখা ছিলো'মহাশয়'। এবার একেবারে 'প্রিয়তম'। তবে তো কুমুদ চিত্রসেনার কাছে সব কিছুই দাবী ও আশা করতে পারে। কুমুদ ভারী খুশী হ'লো এই ভেবে যে, চিত্রসেনাও তা'কে ভালোবাসে। নইলে 'প্রিয়তম' লিখ্‌তে পারে; কিন্তু কেবল লজ্জার খাতিরে প্রিয়তম কেটে পূজনীয় লিখেছে। এ সম্বোধনেও তো চিত্রসেনা কুমুদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে। আরো খুশী হ'লো যে, তাদের ভালোবাসা গতানুগতিক ভাবে না হ'য়ে শাশ্বত ধারায় হয়েছে—কেউ কাউকে না দেখেই পরস্পরে পরস্পরকে ভালো বেসেছে, সেইটাই তো হচ্ছে প্রাণের টান এবং রোমান্স তো সেইখানেই।

তারপর চিঠির বুকে রয়েছে একটু অনুযোগ। কেনো কুমুদ চিঠির উত্তর দেয়নি। লেখা আছে,—চাতকের জল চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লোকে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষার তুলনা করে। কিন্তু জানিনা চাতকের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কতো প্রবল। আমার মনে হয় আমি যে ভাবে আপনার চিঠির অপেক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হৃদয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছি তা'র কাছে চাতকের আকাঙ্ক্ষা কিছুই নয়। আশা করি এবার আর শুধু নিরাশা নিয়ে দিন কাটাবো না।

চিঠি প'ড়ে কুমুদ ঠিক করলে এবার চিঠি দিতেই হবে, না দিলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। কিন্তু এ চিঠিতেও যে ঠিক সেই ভুল!—ঠিকানা নেই! হায় অভিমানিনী! তোমার সামান্য একটু ভুলের জন্য তুমিও তৃষিত আকাঙ্ক্ষায় নিরাশ হৃদয়ে দিন কাটাচ্ছো, আর আমার অবস্থাতো অবর্ণনীয়। এবার আর নয়, প্রভাতী আপিস থেকে ঠিকানা আনবে। তবে নিজে যাবার আগে একবার ভূতনাথ কি প্রবোধকে ব'লে দেখবে যদি তারা এনে দিতে পারে। কারণ সে নিজে গেলে সকলে সন্দেহ করবে। প্রভাতী আপিসে সকলেই তা'কে চেনে।

চিঠি লেখা শেষ করে ভাবতে লাগলো কি ক'রে ঠিকানার কথা পাড়বে। ব'সে ব'সে যখন কুমুদ ভাবছে এমনি সময় তা'র বন্ধুদ্বয় নিজেরাই এসে উপস্থিত। কুমুদ যেনো একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো এবং একটু আনন্দিতও হলো। এ-কথা সে-কথার পর সে সব সঙ্কোচ দমন ক'রে ফট্ ক'রে ব'লে ফেললে—হ্যাঁ হে, তোমরা আমার একটু উপকার করতে পারো?

বন্ধুরা ব্যাপার বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

কুমুদ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে—যদি দয়া ক'রে প্রভাতী আপিস থেকে আমায় চিত্রসেনার ঠিকানা এনে দাও।

প্রবোধ কুমুদের কথা শুনে হেসে বল্লে—এর জন্যে এতো গৌর-চন্দ্রিকা গাওয়া হচ্ছিলো কেনো ? সোজা কথায় বল্লেইতো চল্‌তো।

ভূতনাথ জোর দিয়ে বল্লে—আল্‌বৎ এনে দেবো। তোর মানসীর ঠিকানা এনে দেবো না!—এতে ভণিতার অবতারণা কর্‌ছিলি কেনো ?

কুমুদ একটা মহা সমস্যার হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বন্ধুদের কাছে হৃদয় উদ্‌ঘাটন ক'রে চিত্রসেনার সব কথা ব'লে গেলো। বন্ধুরা তাকে ঠিকানা এনে দেবে আশ্বাস দিয়ে চ'লে গেলো।

তার পর দিনই ঠিকানা এসে হাজির হ'লো। কুমুদ সেই দিন থেকে নিত্য নব নব অনুরাগে চিত্রসেনাকে পত্র দিতে লাগ্‌লো। কিন্তু ক্রমে এও যেনো পুরোণ হ'য়ে গেলো। দেখা ক'রে মানসীর পূজা কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠ্‌লো অথচ লজ্জার খাতিরে নিজে দেখা কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌তেও কুণ্ঠা বোধ কর্‌তে লাগলো।

মানুষের স্বভাবই এই যে, দৃষ্টি যেখানে বাধা পায়, সেইখানে তা'র অপর পারে কি আছে দেখবার জন্যে সে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। সামনের দৃশ্য তখন আর তা'কে মোহিত কর্‌তে পারে না।

কুমুদের অবস্থাও তাই। চিঠির ভিতর তৃপ্তি না পেয়ে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে।

ভগবান যেনো কুমুদের এই আন্তরিক বাসনা কাণে শুন্‌লেন। একখানি চিঠি এলো। চিঠিখানি কিন্তু পোষ্টাপিসের কর্ত্তাদের কৃপায় নানা পোষ্টাপিস ঘুরে, ঘোরার চিহ্ন নানা পোষ্টাপিসের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে নিয়ে, তিলকধারী বৈষ্ণবের মতো চারদিন পরে এসে উপস্থিত।

কুমুদ উৎসুক আতঙ্কে চিঠিখানি খুল্‌লে। বেশী কিছু লেখা

নেই,—"আজ আমার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা দেখা করবেন। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষায় রইলাম।"

কুমুদ আকাশের চাঁদ যেনো হাতে পেলে। কিন্তু যেদিন দেখা করবার কথা, সেদিন তো চারদিন আগে এগিয়ে গেছে। তা'তে কি? দেখা করবার অনুমতি যখন পেয়েছে তখন আজই যাবে। এবং এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাবে।

আজ তা'র জীবনের একটা শুভক্ষণ। মন প্রথম মিলনের অজানা আনন্দে নেচে নেচে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। সমস্ত দিন তা'র এই মিলন-আশার আনন্দের ভিতর দিয়ে কেটে গেলো।

সন্ধ্যা বেলা কুমুদ তা'র অজানা মানস-প্রেয়সীর সঙ্গে মেল্‌বার জন্যে অভিসার যাত্রা করলে। পথ আর ফুরোয় না। ব্যগ্র আবেগে তা'র মনে হ'তে লাগ্‌লো যেনো, এ পথের শেষ নেই, সীমা নেই। পথ যেনো তা'কে পিছনের দিকে নিয়ত টেনে নিচ্ছে, এগুতে দিচ্ছে না।

যাই হোক কোনো রকমে সে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌছলো। বাড়ীটা একটা সরু গলির মধ্যে। সামনে অনেকখানি জায়গা প'ড়ে। সেই জায়গা পার হ'য়ে তবে বাড়ীর দোরে পৌছনো যায়। সাম্‌নেটা অন্ধকার। বাড়ীর একটা নীচের ঘর হ'তে একটা মিট্‌ মিটে আলো দেখা যাচ্ছে। এই সব দেখে তা'র মন দমে গেলো। আশা ক'রে এসেছিলো—তা'র মানসী নিশ্চয়ই বিজলী বাতীর ঝাড় ঝোলানো রোশনাইদার বাড়ীতে থাক্‌বে। কিন্তু এ কি! একেবারে এদোঁপড়া বাড়ী! মনকে ধম্‌কে বল্‌লে, বাড়ীতে কি হবে, পাঁকেই পদ্মফুল ফোটে।

সেই ক্ষীণ আলোকে কুমুদ, তার আশার ধ্রুবতারা ক'রে, অন্ধকারে

পথ হাতড়ে বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছলো। দরজার পাশের যে-ঘর থেকে আলো আস্‌ছিলো সেই ঘরে উঁকি মেরে দেখলে একজন চাকর একটা বটতলার চোথা কাগজে ছাপা রামায়ণ পড়ছে। কুমুদ সাহসে ভর ক'রে তা'কে আস্তে আস্তে ডাক্‌লে।

চাকরটা বেরিয়ে আস্‌তেই কুমুদ তাকে কোনো কথা বলবার আগেই তা'র হাতে একটা টাকা আনন্দের আতিশয্যে গুঁজে দিলে। চাকরটা ব্যাপার বুঝতে না পেরে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কুমুদ পরে তা'কে প্রশ্ন ক'রে জেনে নিলে, বাড়ীতে পুরুষ কেউ থাকে না, মেম সাহেব একলা থাকেন ও ইস্কুলে কাজ করেন। বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করায় তাঁর আপত্তি নেই। এই সব খবরে আশ্বস্ত হ'য়ে মেম সাহেবকে দেখা কর্‌বার এত্তালা পাঠিয়ে দিলে কুমুদ। বেহারা তা'কে একটা ক্ষীণ আলোকিত ঘরে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলো।

কুমুদ বাড়ীর ভিতরের রাস্তার দিকে মুখ ক'রে বসলো। পাছে, পিছন ফিরে বস্‌লে তা'র প্রেয়সী অলক্ষ্যে এসে তাকে অপ্রস্তুত ক'রে দেয়। দরজায় একটা পর্দা টাঙিয়ে ভিতর ও বাহিরের ব্যবধান রক্ষা করা হয়েছে।

কুমুদ প্রতীক্ষায় ব'সে ব'সে ভাবতে লাগ্‌লো, কি ব'লে কথা আরম্ভ কর্‌বে। কি ব'লে বিলম্বের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বে। ভেবে কিছুই ঠিক কর্‌তে না পেরে মানসীর রূপ কল্পনায় মহড়া কর্‌তে লাগলো।—অনেক কিছু কল্পনা করার পর ঠিক কর্‌লে সে তন্বী, রং উজ্জ্বল না হলেও মাজা। মাথার চুল নিশ্চয়ই এলোনো। পরণে তার নিশ্চয়...। তা'র ভাবনা ভাঙিয়ে গুরু পদক্ষেপ কাণে এলো। সে চম্‌কে উঠলো। এতো তন্বীর লঘু পদক্ষেপ নয়। বিস্ময় বাড়িয়ে

ঘরে ঢুকলো এক স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া। পরণে থান। রং কালো বল্‌লেও কালোর অপমান করা হয়।

রমণী ঘরে ঢুকেই ভারী গলায় বল্‌লে—কাকে চান আপ নি?

কুমুদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রে এলো। সে শিষ্টাচার ভুলে চেয়ারেই ব'সে রইলো।

কিছু পরে নিজেকে একটু সাম্‌লে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখানে চিত্র-সেনা ব'লে কেউ থাকেন?

রমণী বিরক্ত হ'য়ে উত্তর কর্‌লে, ও নামের কেউ এখানে থাকে না বা ছিলো না কোনো দিনও। পরে একটু থেমে নিজেই নিজের পরিচয় দিতে লাগলো—আমি স্কুল ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্। আমার নাম চারুবালা। আপনার যদি দরকার না থাকে তো যেতে পারেন।

কুমুদের কাণে কোনো কথা গেলোনা; সে আশা ভঙ্গের দারুণ মন বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে ব'সে রইলো। এমন ক'রে যে তা'র আশা ভঙ্গ হবে এ সে কল্পনাও করেনি। মানসী তা'কে শেষে এমনি ক'রেই ছলনা কর্‌লে!

রমণী কুমুদের এই ভাব দেখে আরো বিরক্ত হ'য়ে বেয়ারাকে ডেকে বল্‌লে—বাবুকে বাইরে রেখে আয় আলো দেখিয়ে। ব'লে পর্দ্দা ঠেলে সশব্দে ঘর থেকে চ'লে গেলো।

বেয়ারা ব্যাপার কিছু বুঝ্‌তে না পার্‌লেও বক্‌শিসের লোভে একটু কোমল স্বরেই ডাক্‌লে—বাবু, আসুন।

কুমুদের চমক ভাঙ্গলো। সমস্তটা যেনো স্বপ্ন ব'লে মনে হ'লো। সে টল্‌তে টল্‌তে বাইরে বেরিয়ে এলো। তা'র চলার ভঙ্গী দেখে একটা রাত-প্রহরী পাহারা ওয়ালা তা'কে অলক্ষ্যে অনুসরণ কর্‌লে।

কুমুদকে এই জব্দ করার ভিতর ভূতনাথ ও প্রবোধের যে কতো-খানি কারসাজী ছিলো তা তারা ভিন্ন আর কেউ জান্‌লো না।

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গর্ব্বী।

নাহি জানি লঘু কিম্বা গুরুজন আমি
আত্মীয় কি অনাত্মীয়, ঘৃণিত কি প্রিয় দিবাযামী
ধরার মাঝার
অযোগ্য বা নয়নের আনন্দ তোমার
একান্ত আপন না সে সব চেয়ে পর
বুকের মাণিক কিম্বা ব্যথার নির্ঝর।

বুঝিনাকো—চাহিনাকো বুঝিতে সে কথা
আমি শুধু প্রিয়তমে মরমের জানি এ বারতা
জীবনে মরণে
হৃদয়ের প্রেম মোর তোমারি চরণে
সুখে দুঃখে চিরদিন রবে অচঞ্চল
কণ্ঠের মালিকা হবে তোমারি অঞ্চল।

আজি মোরে রাখিয়াছ প্রাণ হ'তে তব
নিয়ত যে দূরে ঠেলি, ভেবেছ কি নীরবে তা সব?
লেখনী আমার
রচিবেনা ছন্দে তার তীব্র তিরস্কার?
বেদনায় নিপীড়িত তারি গুপ্ত ভাষ
শান্তি তব অহরহ করিবেনা গ্রাস?

বক্ষে দিয়া আলিঙ্গন, অধরে চুম্বন
একদিন বলো নাই 'তোমারি ও হৃদয়-শয়ন
শুধু মোর ঠাঁই
জন্মে জন্মে যেন বঁধু তোমারেই পাই'
উচ্ছ্বসিত অনুরাগে বলো নাই আসি
'ভালোবাসি'—প্রিয়তম, 'বড় ভালোবাসি' !

তোমারে পাইতে চাই দু'টি বাহু পাশে—
তুমি আজ দয়া করি ক্ষণতরে আসি মোর বাসে
দাঁড়ায়ে তফাতে,
পাছে লাগে গায়ে গায়ে, হাত বাধে হাতে
কর তাই চলাফেরা অতি সাবধানে
হায় নারী ! লাজে মরি নারীত্বের ভানে ।

আজ মোর তোমা'পরে নাহি অধিকার
এই কি বলিতে চাহ ? কহিওনা এই মিথ্যা আর ;
তুমি যে আমার—
নয়নের নিদ নিলে, সিঁধ কেটে হিয়ার মাঝার
কার ঘরে ছিলে তুমি, গেলে কার ঘরে
আমার কি যায় আসে, তাহার খবরে ?

ছুঁইতে না চাহ যদি, ছুঁইয়োনা প্রিয়ে
চ'লে যেয়ো আল্‌গোছে, মনোরমে মোর পাশ দিয়ে
প্রাণের অতলে
যে প্রদীপ্ত শিখা তব মনিদীপে জ্বলে

তাহারে নিবাবে কিসে ? তুমি মোর নহ
চুপ্, চুপ্—হেন বাণী মুখে নাহি সহ।

যদি না মরিয়া থাকে বৃদ্ধ ভগবান
বধির হইয়া নাহি গিয়ে থাকে দুটি তার কান
এই পাপ কথা
পশিলে শ্রবণে তার, বিহীন মমতা
তোমারে সে দিবে যেই নিদারুণ ফল
স্মরি তাহা, হৃদি মোর শিহরে কেবল।

আমার প্রেমের শাস্ত্র মানেনা ভুবনে
কেবা নিঃস্ব, কেবা ধনী—ছোটো বড়, লঘু গুরুজনে
আমি শুধু জানি
এ অধরে ও অধর মিলাইয়ো আনি
দুইজনে রহি যদি দুজনের আশী
তুমি যদি ভালোবাসো, আমি ভালোবাসি।

আমি যদি গুরুজন, দূরে দূরে থেকো
আমি যদি লঘু তবে নিশিদিন তফাতেই রেখো
অধর, কপোল
যাউক্ নিপাত তব, করিবনা গোল
চাহিনা দরশ তবে, চাহিনা পরশ
দেখা দিয়ে বাড়ায়োনা আমার অযশ।

কার দোষ, তুমি আজ গেলে পর'বাসে
কেবা দায়ী, তস্করের মত যদি অজানিতে আসে
প্রেমের বিদ্রোহী ?
চাটুভাষে সরলার তনুমন মোহি
গোপনে লইয়া যায় হরিয়া তাহায় ?
নিয়তির ষড়যন্ত্র, দূষিবে কাহায় ?

আমি যদি সত্য প্রেমী, নিষ্পাপ পরাণ
তোমারে যে করিয়াছি অকপটে সরবস্ব দান
ধরণীর পরে
সফল হইবে তাহা বাহিরে অন্তরে
প্রেম মোর তোমারেই প্রেয়সীর সাজে
আনিবে করিয়া জয়, এই বক্ষোমাঝে।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

চক্র

জীর্ণ একতলা বাড়ীর একটি কক্ষে মাতা উদ্বিগ্ন মুখে রুগ্ন পুত্রের শয্যা পার্শ্বে বসিয়াছিল। ঔষধ ও পথ্য এ বেলায় কোন রকমে চলিতে পারে, তাহার স্বামী যদি আজও রিক্ত হস্তে ফেরেন, তাহা হইলে কি উপায়ে যে ঔষধ পথ্য সংগ্রহ হইবে তাহাই ভাবিয়া জননী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কোন প্রতিবেশিনীর পদধূলি ত আজ পর্য্যন্ত তাহার গৃহে পড়ে নাই; কেনই বা পড়িবে? এই অপরিচিতাকে আসুন বলিয়া সম্বোধন করিতেও সে সাহস করিল না, সে শুধু সকরুণ নিষ্পলক দৃষ্টি অপরিচিতার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

লীলা বিনা সম্ভাষণে বেশ সপ্রতিভ ভাবে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রুগ্ন শিশুটির মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া জননীর দিকে ফিরিয়া স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ ভাই, এটী বুঝি তোমার ছেলে; কি অসুখ হয়েছে ভাই?

উষার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বাষ্পাকুল কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ দিদি, এটী আমারই ছেলে—আজ বার দিন জ্বরে বেহুস হ'য়ে পড়ে আছে।

লীলা মনে করিল, পুত্রের পীড়ার জন্য আশঙ্কায় জননী এমন করিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে সে কহিল, ভয় কি ভাই,

জ্বর হয়েছে সেরে যাবে। বারদিন হ'য়েছে, চোদ্দ দিনের দিন জ্বর ছেড়ে যাবে।

ঊষা চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, ডাক্তার বাবুও তাই বলে' গিয়েছেন। ছেলে নিয়ে একলা বসে থাকতে আমার বড্ড ভয় করে।

লীলা সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, তা' তো করবেই ভাই, তোমার স্বামী বুঝি আপিসে চাকরী করেন ? ছুটী পান না ?

ঊষা ইহার কি উত্তর দিবে ; সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া লীলা বলিল, তোমার বুঝি এখনো নাওয়া খাওয়া হয়নি ? ছেলে ছেড়ে কি করেই বা যাবে ! আমি বসছি, তুমি নেয়ে খেয়ে এস ভাই।

ঊষার দুই চোখে আবার অশ্রু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। আজ দুই দিন তাহার পেটে অন্ন পড়ে নাই, তাহার স্বামী যাহা কিছু আনিয়াছে সে সমস্তই পীড়িত পুত্রের ঔষধ ও পথ্যে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। স্বামীকে সে কথা সে জানিতে দেয় নাই, জানিলে সে নিশ্চয়ই যে কোন উপায়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত। পুত্রের জন্ম সে সব করিতে পারে, কিন্তু নিজের পেটের জন্ম—না না সে কিছুতেই পারে না। শুধু জল খাইয়া সে তো বেশ আছে, কই এমন কি কষ্ট তাহার হইতেছে ! এই অপরিচিতা নারীর কাছে কথাটাও সে কিছুতেই যে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। তাই প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্তে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া সে কহিল, আমি খেয়েছি দিদি, রাত জাগতে হয় কিনা, তাই এমন দেখাচ্ছে।

লীলা কথাটা অবিশ্বাস করিতে পারিল না, সে মনে করিল স্বামীকে পুত্রের কাছে বসাইয়া সে সকাল সকাল খাইয়া লইয়াছে। সে বলিল, তা' হ'লে তুমি একটু গড়িয়ে নাও ভাই, আমি খোকার কাছে

বস্‌ছি ; তোমায় তো আবার রাত জাগতে হবে।

উষা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি অদ্ভুত স্নেহময়ী এই অপরিচিতা নারী ! পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ইনি নিশ্চয়ই নবাগতা, তাহাদের প্রকৃত পরিচয় জানেন না ; জানিলে কখনও তিনি এ গৃহে পদার্পণ করিতেন না, তাহাদের দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতেন ; স্নেহের কণা মাত্র তাহার অন্তরে স্থান পাইত না। কিন্তু কি অপরাধে তাহাদের আজ এই দুর্দ্দশা ? সে যদি সত্যই পতিতার কন্যা হয়, সে নিজে ত পতিতা নয়, তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার স্বামী ত মহানুভবতারই পরিচয় দিয়াছেন, অথচ তজ্জন্য তাহাদের এই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইতেছে। সমাজের এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যে তাহার স্বামী আজ অমানুষ ; লোক চক্ষে ঘৃণ্য। সমাজের ত কিছুই হইল না, ফলে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তাহাদের চির-সাথী হইয়াছে। এখন ত' বাহিরের লোককে কোন দোষ দেওয়া যায় না।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া লীলা আবার বলিল, বসে রইলে কেন ভাই, শোও ; রোগের সেবা করা আমার অভ্যাস আছে।

উষা আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, দিদি, তোমায় এ দয়া আমি জীবনে ভুলতে পারবো না, আমাদের কেউ দয়া করে না, আমাদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়—তুমিও তাই কর দিদি, তুমিও তাই কর। লীলা ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল, তোমাদের সঙ্গে পাড়ার লোকেদের বুঝি ঝগড়া ভাই ? আমি মাসীমাকে বল্‌বো তিনি সব মিটিয়ে দেবেন।

উষা কি বলিতে যাইতেছিল এমনি সময় খোকা কাঁদিয়া উঠিল ; সে তাহার মুখের ওপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গভীর স্নেহে তাহার মাথায়

ও মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, কি হয়েছে খোকা? মাথা খুব ব্যথা কর্‌ছে? তুমি চুপটি করে শোও, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

খোকা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল বাবা কোথায় মা? বড্ড মাথা ব্যথা কর্‌ছে ওষুধ দিয়ে দেবে।

উষার স্বামী পরমানন্দ এতক্ষণ বারান্দায় এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এই দুই নারীর কথোপকথন শুনিতেছিল; খোকার কথা কাণে আসিতে আর সে বাহিরে থাকিতে পারিল না, টলিতে টলিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।

পদশব্দে চমকিয়া উঠিয়া সেই দিকে চাহিয়া উষা লীলার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, শীগ্‌গির এখান থেকে যাও, যাও।

লীলা একবার পরমানন্দের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার উচ্ছৃঙ্খল চেহারা ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া তাহার অন্তরে কেমন ভয়ের সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরমানন্দ জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কে ও? উষা ভীত ভাবে বলিল, চিনি না,তুমি খোকার কাছে এসে বস, ও তোমায় খুঁজছে।

পরমানন্দ চাপা গলায় কহিল, বড্ড মদ খেয়েছি; মুখে কি রকম গন্ধ বেরুচ্ছে টের পাচ্ছ না। ব্যায়রামী ছেলে, এ বিকট গন্ধ নাকে গেলে ওর মাথার যন্ত্রনা যে বেড়ে যাবে, আমি এইখানে একটু শুয়ে পড়ি, তুমি ওকে বল বাবার অসুখ করেছে, তা' হ'লে আর সে আমায় ডাক্‌বে না। এই বলিয়া সে—মেঝের ওপর শুইয়া পড়িল এবং আপন মনে বকিতে লাগিল, বেটা বড় লোকরা কি চিজ! পাঁচ টাকা দামের এক বোতল মদ স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পার্‌লে আর ছেলেটার অসুখ বলে নগদ দু'টো টাকা চাইলুম, তা দিতে পার্‌লে না। যাক্ তবু তো

বেটার পাঁচটাকা লোক্সান করে এলুম।

উষা বেদনানিপীড়িত কণ্ঠে বলিল, চুপ করে ঘুমোও, মাথাটা সুস্থ হয়ে যাবে খন।

লীলা মাতুল গৃহে ফিরিয়া যাইতেই তাহার মামীমা বলিলেন, হ্যাঁরে লীলা, তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

লীলা বলিল, দিদির বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম। মামীমা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, এখানে আবার তোর দিদি কে আছে?

লীলা বলিল, ঐ যে পাশের বাড়ী যারা থাকে, যাদের সঙ্গে পাড়ার সবায়ের ঝগড়া।

মামীমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বলিস্ কিরে! ওই বাড়ীতে তুই গেছলি। কি সর্ব্বনাশ!

লীলা কহিল, কেন মামীমা, তা'তে কি হয়েছে? উষা দিদি তে বেশ লোক দেখ্‌লাম্।

মামীমা বলিলেন, ওদের কি জাত আছে, আর ওর স্বামীটা, বলে ত' স্বামী, জানিনা কি রকম স্বামী, একটা মাতাল বদ্‌মায়েস। শুনি, ভদ্দর লোকের ছেলে, দেখ্‌লে তো তা' মনে হয়। ভাগ্যিস্ তার সাম্‌নে পড়িস্‌নি।

লীলা বলিল, কে একজন মাতালের মত লোক ঘরে ঢুক্‌তেই উষাদিদি আমায় চলে যেতে ব'ল্‌লে, সেই বোধ হয় উষা দিদির স্বামী। সত্যি. তা'কে দেখে আমার ভয় হয়েছিল। তা' হ'লে উষাদিদির তো ভারী কষ্ট! খুব গালাগালি মার্‌ধোর করে'। বোধ হয়?

মামীমা বলিল, পাড়ায় মদ খেয়ে খুব চেঁচামেচি করে' কিন্তু বৌটাকে কিছু বলে' না। আমরা কতদিন লুকিয়ে দেখেছি ঘরের

মধ্যে ঢুকে একেবারে চুপ হয়ে যায়; বৌটাকে বোধ হয় খুব ভালবাসে, বৌটাও খুব সেবা যত্ন করে'। তবু মাসের মধ্যে আদ্দেকদিন বৌটা খেতেই পায় না! প্রায়ই তো উনুনে আগুন পড়ে না, কি খায় সেই জানে, অথচ লোকটা এসে যখন জিজ্ঞেস করে, তখন বলে, হ্যাঁ খেয়েছি। কিন্তু মুখ দেখলে তা' তো মনে হয় না।

উষার শুষ্ক মুখখানি লীলার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ব্যথিত কণ্ঠে সে কহিল, আজ তার মুখখানা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখলাম; নিশ্চয়ই কিছু খায়নি। আমি জিজ্ঞেস কর্‌লাম, খাওয়া হয়েছে দিদি; বল্‌লে, হ্যা। বোধ হয় মিথ্যে কথা বল্‌লে!

মামীমা বলিলেন, উপোস করা ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

উষা তাহার মামীমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে মাসিমাতার অজ্ঞাতসারে লীলা আবার উষার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পরমানন্দ গৃহে ছিলনা; উষা রুগ্ন শিশুর পার্শ্বে শুইয়াছিল। সকাল হইতে শিশুর পেটে এক ফোঁটা ঔষধ পড়ে নাই; তাহার স্বামী অর্থের জন্য বাহির হইয়াছে, হয় তো কি একটা কাণ্ড করিয়া ফিরিবে—ইহাই ভাবিয়া উষা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামীকেই বা সে কি দোষ দিবে—সে তো বাপ; বাপ হইয়া কেমন করিয়া সে বিনা ঔষধ পথ্যে চোখের উপর পুত্রকে মরিতে দেখিবে। অর্থতো চাই, যে উপায়েই হউক্। ভগবান! ভগবান!

এমন সময় দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া লীলা ডাকিল, দিদি!

উষা ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। সে নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না! আর তো এই নারীর কাছে তাহার প্রকৃত পরিচয় গোপন নাই, জানিয়া শুনিয়া সে আবার আসিয়াছে!

লীলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, কাল তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌লে কেন ভাই?

উষার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এ মেয়েটী তাহা হইলে তাহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছে।

লীলা বলিল, তুমি সত্যি করে' বলতো ভাই, কাল তুমি কিছু খেয়েছিলে কিনা? নিশ্চয়ই কিছু খাওনি, আমি তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি, তোমায় না খাইয়ে আমি কিছুতেই যাচ্ছিনা।

উষার সারাদেহ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে কম্পিত পদে শয্যা হইতে নামিয়া লীলার হাত চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দিদি. সত্যি খাইনি, কাল কেন আজ তিন দিন খাইনি; তুমি বল না দিদি সকাল থেকে যার রুগ্ন সন্তানের পেটে এক ফোঁটা ওষুধ পড়েনি, তার গলা দিয়ে কিছু গলে?

লীলার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে আঁচল হইতে একখানি দশটাকার নোট খুলিয়া লইয়া উষার হাতে দিয়া বলিল, খোকার ওষুধ আন্‌তে দাও দিদি।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে উষা ক্ষণকাল সেই নোটখানার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে লীলার পা জড়াইয়া ধরিল।

লীলা শশব্যস্তে পা সরাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, এ কি তোমার অন্যায় ভাই, তুমি আমার পায়ে হাত দাও; আমি আর এখানে থাক্‌ব না। এই বলিয়া সে কক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উষা মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, তাহার চোখের জলে বক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল।

সেদিন লীলার মাতুল-গৃহে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। তখন

সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, ঘরে ঘরে দীপ জলিয়া উঠিয়াছে। লীলার মাতুল বিপিনবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় "আমার মা কই, আমার মা কই?" বলিতে বলিতে মত্তাবস্থায় পরমানন্দ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইতি পূর্ব্বে কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে কি সুস্থ কি মত্ত কোন অবস্থাতেই সে প্রবেশ করে নাই। তাই বিপিন বাবু হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত, চমকিত ও ভীত হইয়া উঠিলেন।

পরমানন্দ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছিল না, সে কোন রকমে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া একখানি চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপর বিপিন বাবুর দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, বড়বাবু নমস্কার, আমার মা কই, মাকে আমি দেখতে এসেছি, পায়ের ধুলো নিতে এসেছি, পায়ের ধুলো—

বিপিনবাবু রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মাত্‌লামীর আর জায়গা পাওনি, যাও এখান থেকে। পরমানন্দ বলিল, মাতাল হয়েছি তা তো দেখতে পাচ্ছেন বড়বাবু, কিন্তু মাতলামী করি নি, মাকে দেখতে এসেছি বড়বাবু, পায়ের ধূলো নিতে এসেছি—পায়ের ধূলো; মাতলামী করি নি।

বিপিনবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেরিয়ে যা বেটা মাতাল কোথাকার, এতদিন রাস্তায় গোলমাল কর্‌তিস্ কিছু বলিনি বলে একেবারে বাড়ী চড়াও হয়েছ—বেরিয়ে যা বল্‌ছি এখনি, না হ'লে পুলিশে দেব।

পরমানন্দ আর কোন কথা না বলিয়া সহসা কম্পিত পদে বিপিন বাবুর দিকে অগ্রসর হইল। খান দুই চেয়ার বাধাস্বরূপ তাহার পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেগুলি ঠেলিয়া মেঝের উপর ফেলিয়া

দেয়া সে একেবারে গিয়া বিপিন বাবুর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিপিনবাবু যেন কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে পরমানন্দ বলিল, তোমার পায়ে পড়ি আমায় পুলিশে দিও না বড়বাবু, মাকে দেখতে এসেছি, পায়ের ধূলো নিতে এসেছি... পায়ের ধূলো নিয়েই চলে যাব—আর থাকব না।

কান্নার শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য মেয়েরা বাহিরের ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিল। অর্দ্ধমুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া তাহারা উঁকি মারিয়া ঘরের ভিতর দেখিতে লাগিল। এমন সময় পরমানন্দ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, মা! আমার মা এসেছ?

মামীমা লীলার দিকে ভীতভাবে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, তুই মা যত সব হাঙ্গামা বাধিয়েছিস্, মাতালটা নিশ্চয়ই তোর খোঁজে বাড়ীতে এসে ঢুকেছে, না হ'লে ও কখনো তো এ বাড়ীতে এসে ঢোকে না।

বিপিনবাবুর বিমূঢ় ভাবটা তখন কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি দেখিলেন—ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া গিয়া সজোরে পরমানন্দের ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে প্রবল ভাবে ঝাঁকানি দিলেন। পরমানন্দ জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, মায়ের পায়ের ধূলো না নিয়ে নড়ছি না; এই শুয়ে পড়লাম, দেখি বাবা কেমন করে তাড়াও, পুলিশে দিও না, মার পায়ের ধূলো...মা কই মা! এই বলিয়া সে কোন রকমে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া মেঝের উপর সটান শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরে বিপিনবাবুর দুই ভৃত্য তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া তুলিয়া, টানিতে

টানিতে রাস্তায় বাহির করিয়া দিল।

এই ঘটনার দিন দুই পরে লীলা পিতৃগৃহে চলিয়া গেল। তারপর তিনমাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ঊষার পুত্র কোন রকমে বাঁচিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। ডাক্তার বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়াছেন। এখানে থাকিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা, পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। পরমানন্দ এখন আর প্রত্যহ মদ খায় না, যদি বা দুই একদিন খায়—মাত্‌লামী করে না। পুত্রকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে লইয়া যাইতে হইলে যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকার সন্ধানে সে ফিরিতে লাগিল। সেই কয়টা টাকা পাওয়াই তাহার একমাত্র কামনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় একদিন আনন্দ-উদ্বেলিত অন্তরে গৃহে ফিরিয়া পরমানন্দ ঊষাকে বলিল, আর ভাবনা নেই, আজ রাত্রেই দু'শ টাকা পাব, আর দেরী ক'র না, কালই বেরিয়ে পড়ব।

ঊষা শঙ্কিত হইয়া বলিল, অত টাকা......বাধা দিয়া পরমানন্দ বলিল, ভয় নেই ঊষা, ভগবান মিলিয়ে দিচ্ছে, চুরী কর্‌তে হবে না। তবুও ঊষার মনটা হাল্কা হইল না, সে বলিল, আমি সে কথা বলিনি, কোথায় টাকা পাচ্ছ তাই জান্‌তে চাইছিলাম।

পরমানন্দ বলিল, সে এক দাঁও জুটে গেছে ; এক জনের বাড়ী গিয়ে রাত্রে একবোতল মদ কিনে আন্‌তে হবে...ব্যস্‌! অমনিই দু'শ টাকা হাতে এসে যাবে। বলে দিয়েছি, আগাম একশ টাকা না দিলে কাজে হাত দিচ্ছি না।

ব্যাপারটা ঊষা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও সে আর কোন প্রশ্ন করিল না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীদের উপর মদ, আফিং

গাঁজার দোকানের ভার দিবার নূতন রেওয়াজ হইয়াছিল। নিরঞ্জন বি, এ, পাশ করিয়া প্রায় পনেরো, ষোল, বৎসর মাত্র আশীটাকা বেতনে এক সওদাগরী অফিসে কাজ করিতেছিল। তাহাতে অতিকষ্টে তাহার সংসার চলিত। তারই একজন সহপাঠী আবগারী বিভাগের সুপারিটেন্‌ডেণ্ট ছিল, তাহারই চেষ্টায় নিরঞ্জন কিছুদিন হইল একটী মদের দোকানের মালিক হইয়াছে। তাহাতে মাসিক প্রায় চারিশত টাকা আয়, কাজেই নিরঞ্জনের সংসার এখন বেশ স্বচ্ছন্দেই চলিতেছিল। ঐ দোকানটি ছিল বৃন্দাবন সাহার, সে পনেরো বৎসর ঐ দোকান চালাইয়াছিল, কাজেই তাহার এতবড় আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় নিরঞ্জনের উপর তাহার জাতক্রোধ হইয়াছিল এবং কি উপায়ে তাহাকে জব্দ করা যায় তাহারই ফিকির খুঁজিয়া বেড়াইতে ছিল। সম্প্রতি সে সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিরঞ্জনের সহপাঠী বন্ধু বদ্‌লী হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন আবগারীর দারোগার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, রাত্রে বাড়ীতে মদ বিক্রয় করিবার অপরাধে নিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এই কাজের গোয়েন্দা স্বরূপ বৃন্দাবন পরমানন্দকে নিযুক্ত করিল। একটী কাপড়ের পুঁটলীতে দুইটী মদের বোতল বাঁধিয়া, আর একটী বোতল কাগজে জড়াইয়া ও ছয়টী মার্কা দেওয়া টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, চারিটী বোতল সমেত ঐ পুঁটলীটি নিরঞ্জনের বাহিরের ঘরে খাটের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে আর ঐ ছয়টী টাকা তক্তাপোষ বা টেবিলের উপরই হউক ফেলিয়া রাখিয়া কাগজে মোড়া বোতল লইয়া সোজা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। নিকটেই দারোগা পুলিশ প্রহরী লইয়া অপেক্ষা করিবে; পরমানন্দ বাহির হইয়া আসিবা মাত্র তাহারা সদল বলে প্রবেশ করিয়া নিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিবে।

যথাসময়ে পরমানন্দ প্রাণ ভরিয়া মদ খাইয়া দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া বৃন্দাবনের সম্মুখে হাত পাতিয়া বলিল, টাকাটা দাও বাবা। বিনাবাক্যব্যয়ে বৃন্দাবন দশখানি নোট গুনিয়া তাহার হাতে দিল। পরমানন্দ একশ টাকা পকেটে রাখিয়া মহোল্লাসে নিরঞ্জনের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। কথা রহিল, কাজ শেষ করিয়া আসিতেই বাকী একশ টাকা তখনই তাহাকে দেওয়া হইবে। পরমানন্দের আহ্লাদ আজ দেখে কে! কালই সে সদ্য রোগ-মুক্ত পুত্রকে লইয়া বৈদ্যনাথ যাত্রা করিবে।

নিরঞ্জনের গৃহদ্বারে আসিয়া বার দুই ডাকিতেই নিরঞ্জন আসিয়া বাহিরের ঘরের দ্বার খুলিয়া দিল। পরমানন্দ সোজা তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, দরজাটা শিগ্‌গীর বন্ধ করে দিন মশাই। বিস্মিত নিরঞ্জন তাহার কথানুযায়ী দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরমানন্দ ততক্ষণে পুঁটলীটি তক্তাপোষের নীচে রাখিয়া দিয়াছে এবং টাকা ছয়টী বাহির করিয়া সবে তক্তাপোষের উপর রাখিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় "বাবা এতরাত্রে কে ডাক্‌ছিল?" বলিয়া একটী যুবতী সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দের সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল।

পরমানন্দ বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমার মা যে, তুমি এখানে? লীলাও পরমানন্দকে চিনিল, বলিল, এই তো আমাদের বাড়ী, আর এই আমার বাবা, খোকা ভাল আছে?

পরমানন্দ আতঙ্কে বলিয়া উঠিল, কি বল্‌লে মা, নিরঞ্জন তোমার বাবা। মা! মা! বলিতে বলিতে হাতের টাকা কয়টী ঝনাৎ করিয়া

পকেটে ফেলিয়া, পুঁটলটি তক্তাপোষের নীচ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া হাতে ঝুলাইয়া পরমানন্দ ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিয়া বৃন্দাবনের দল জয়োল্লাসে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। রক্তবর্ণ চোখে তাহাদের দিকে একবার চাহিয়া পরমানন্দ পুঁটলীটি ও কাগজে মোড়া বোতলটা রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর পকেট হইতে সেই ছয়টি টাকা ও নোটের তাড়াটি টানিয়া বাহির করিয়া হতবুদ্ধি বৃন্দাবনের দেহের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়া পাগলের মত রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

—আরো মিষ্টি ক'রে-

আরো মিষ্টি ক'রে বন্ধু আরো মিষ্টি ক'রে,
গাইতে হবে গান কি আমায় সমস্তক্ষণ ধ'রে ?
ছুটি আমি চাই বারেবার, কেউ দেবেনা ছুটি ?
আসর ভাঙ আসর ভাঙ এবার আমি উঠি।
তোমরা এত গানের কাঙাল গানের দেশে এসে ?
বাতাস হেথা গানে ভরা আকাশ গানে মেশে !
বাংলাদেশের পথে ঘাটে স্রোতস্বিনীর সুরে
মর্ম্মরিত বনে বনে গান যে বেড়ায় ঘুরে !
আমার গান কি লাগবে ভালো পাখীর গানের চেয়ে ?
রাখাল ছেলের বেণুখানির আভাসটুকু পেয়ে ?
শুনেছত' ঝরঝরানি অন্তর মন ভ'রে ?
তোমরা আমায় গাইতে বলো আরো মিষ্টি ক'রে ?
ঘুমিয়ে-পড়া জাতের কেন ঘুম পাড়ানো গানে
মিষ্টি সুরের মাদকতায় আনবো নেশা প্রাণে ?
ফুলের গন্ধ দখিন হাওয়ার কাজভোলানোর রেশে
মন্দ মধুর কাব্য কেন ধর্‌বো সর্ব্বনেশে ?
তোমরা যত আসবে কাছে ততই যাব স'রে।
ক্ষমা কোরো গাইবোনা গান অত মিষ্টি করে !

বহুত বহুত কাজ রয়েছে মানুষ হবার দিকে,
জাগো বন্ধু ঠিক ক'রে নাও সৌখীন প্রাণটিকে !
রৌদ্র আছে ঝঞ্ঝা আছে আছে বিঘ্নবাধা ;
এই জীবনের পথের পরে মনটি রাখো সাদা !
বীরের মত চলো, চলো খাঁটি প্রাণের জোরে !
আজকে কবি গাইবে নাক' মিষ্টি ক'রে ক'রে।
এমনি ক'রে খুলে দিয়ে অনেকগুলি আঁখি
যেদিন আমার সামনে চলা থাক্‌বেনা আর বাকি,
সেদিন যদি এসো কাছে আজ এসেছ যারা,
সব অনুরোধ রাখবো সেদিন, কাজ হবে যে সারা !
যাবার বেলায় সেদিন আমি ঘুমিয়ে পড়ার ঘোরে
শেষ মিনতি রাখব তোমার, গাইব মিষ্টি ক'রে।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

—কিংশুক—

সামনের খোলা জানলার ভিতর দিয়ে সোনা রংএর প্রলেপ মাখানো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কিংশুক চা পান করছিল। শরৎএর শেষ। শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। দামী মোটা-ভারী পর্দা সরিয়ে সমীরণ ঘরে প্রবেশ করলে। সে কিংশুকের বন্ধু। নির্জ্জনতা-প্রিয় কিংশুকের মনকে কেবলমাত্র সেই তার যাদুকরী কথার জালে মুগ্ধ করতে পেরেছিল। কিংশুক তাকে দেখতে পায়নি। রাসিয়ান আর্টিষ্টের আঁকা একখানা ছবির দিকে তাকিয়ে কি ভেবে হটাৎ সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। পর্দা ঠেলার শব্দ কাণে এলেও কারও আগমন সম্ভাবনা তার মনে উদয় হয়নি।

বসরাই কার্পেটের ওপর জয়পুরী নাগরাটা ঘসে সমীরণ ধীরে তার সিল্কের রুমালখানা কিংশুকের পিছনে দাঁড়িয়ে তার কোলের ওপর ফেলে দিলে। কিংশুক চম্‌কে উঠে পিছন ফিরল। তার-স্বরে হেসে সমীরণ বল্‌লে, "মনকে কোন জগৎ এ পাঠিয়েছিলে ?"

মৃদু হেসে কিংশুক বল্‌লে, "নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে যখন সে ফিরেই এসেছে তখন আর সে জগৎএর খবরে কাজ কি ? তারপর—খবর কি ? দাঁড়িয়ে রইলে যে—বস" বলে কিংশুক সাম্‌নের সোফার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ কর্‌লে।

আসন গ্রহণ করে সমীরণ বল্‌লে "খবর আছে বৈকি—বিনা খবরে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে তোমার এখানে আড্ডা জমাতে আসিনি।

আমরা কাজের লোক—জ্যোৎস্না পান করে আর কবিতা লিখে তোমাদের মত আমাদের দিন চলে না।”

জামার পকেটের ভিতর হাত পুরে সমীরণ কি যেন অন্বেষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। কিংশুক মৃদু হেসে টেবিলে রাখা কলিং বেল্‌টা টিপ্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে “বয়্” এসে দাঁড়াল। আর এক পিয়ালা চায়ের হুকুম করে কিংশুক সমীরণের দিকে তাকাতেই সে একখানা ফিকে গোলাপী রংয়ের কার্ড বার করে’ কিংশুকের হাতে দিলে।

সেখানি “At home” এর অনুষ্ঠান-পত্র। কিংশুক কার্ডখানি পড়ে সমীরণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, “দেখ বন্ধু তোমার Tea, Music, Social এ আজ পর্য্যন্ত কোন দিনই যোগদান কর্‌বার সৌভাগ্য হ’ল না, অথচ আমাকে invite কর্‌তে তুমি কোন বারই ভোলোনা দেখ্‌ছি।”

“বয়” চা দিয়ে গেল। চা পান কর্‌তে কর্‌তে সমীরণ গম্ভীর গলায় বল্‌লে, “একদিন হয়ত সে সৌভাগ্য হ’তে পারে।” ঘড়ীতে ৯টা বাজ্‌লো। সমীরণ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, “চল্‌লুম্ ভাই, আরও অনেক-গুলো জায়গা ঘুরতে হ’বে। তোমাকে জোর করে’ আমাদের Meeting এ যোগদান করাবার শক্তি আমার নেই, তবু বল্‌ছি সুবিধে হয়ত’ যেও।”

ধীরে সে পর্দ্দা তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। মৃদুস্বরে এক্‌টা গান গাইতে গাইতে কিংশুক লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুক্‌ল—

সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা
সেই কথাটি দেবে ধরা জীবনে,—
আমার গভীর জীবনে॥

(২)

সমীরণের বাড়ীর পিছনে সুপ্রকাণ্ড টেনিস্ কোর্ট। তার ওপরে ছোট ছোট বেতের চেয়ার ও টেবিল পেতে সেদিন "At home" এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক টেবিলে পাট ভাঙ্গা দুগ্ধ-শুভ্র চাদর বিছানো এবং তার ওপর কোজি দিয়ে ঢাকা ছোট ছোট চায়ের কেটলী, কেক্, স্যাণ্ড্উইচেস্, ডালপুরী, মাংসের গুলিকাবাব, ডিমের পোচ, সন্দেশ প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী খাদ্য সম্ভার সাজানো। সমস্তই পোর্সিলিনের কাচের বাসন। প্রত্যেক টেবিলেরই মাঝখানে খুব বড় আধ ফোটা "ম্যার্শ্যাল্ নীল্" বুকে-ধরা ফুলদানি বসানো।

কিছুদূরে ঘাসেরই ওপর একটী সুদৃশ্য অর্গ্যান রাখা হয়েছে।

সবেমাত্র ৫টা বেজেছে। নিমন্ত্রিতবর্গ তখনো কেউ আসেনি। সমীরণ সমস্ত টেবিলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিল কিছু দিতে ভুল হ'ল কিনা। সমীরণের বোন অশোকাও দাদার পাশে পাশে ঘুরে তাকে সাহায্য কর্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে একে একে নিমন্ত্রিত বর্গের আসা সুরু হ'ল। সেবক, প্রবাল. চিন্ময়, ভূপতি প্রভৃতি সমীরণের বন্ধু-মণ্ডলী; শকুন্তলা, পদ্মিনী, অতসী, মঞ্জরী প্রভৃতি অশোকার সতীর্থাগণ; মিসেস্ লাহিড়ী, মিসেস্ চম্পটীর ভীড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই সুপ্রকাণ্ড টেনিস্ কোর্টটি ভরে গেল। সকলের মৃদুগুঞ্জন ধ্বনিতে কিছুক্ষণ পূর্ব্বের নিস্তব্ধ কোর্টটি ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ল।

—এই যে মিস্ মিত্র—আসুন, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলুম্। এবারে ত আপনি B. A দিলেন, না ?

—দেখুন মিষ্টার নন্দী, ওই Artical টার মধ্যে কিন্তু আপনার একটা বড় ভুল থেকে গেছে।

—গানের Prizeটা কল্পনার বাঁধা—চার বছর আজ ও Prizeটা

নিয়ে আস্‌ছে। পদ্মিনী অশোকার সতীর্থা। খুব ভাল গাইতে পারে বলে' তার নাম আছে। সকলের অনুরোধে উঠে অর্গান বাজিয়ে সে গান ধর্‌লে—

তোমার ভুবন মর্ম্মে আমার লাগে
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে' সরস,
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণ রাগে।

সকলেরই মন সুরের সুধায় ভরে' উঠেছিল। বাহ্য জগতের কথা কারো মনে ছিলনা। গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গিছল। সহসা সেই নিস্তব্ধতার মাঝে এসে দাঁড়াল এক তরুণ যুবক।

যুবকের গাত্রবর্ণ অতি গৌর। লম্বায় সে প্রায় ছফিট। সুন্দর মুখখানি ঘিরে সুদীর্ঘ কালোচুল বাতাসে উড়ছিল। অসাধারণ দীপ্তিময় তার চোখ দু'টি। তাকে দেখে সকলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি উঠল 'কিংশুক' 'কিংশুক'। পদ্মিনী গান থামিয়ে বিস্মিত নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালো। সকলেরই দৃষ্টি কিংশুকের দিকে নিবদ্ধ হ'ল। সমীরণ সকলের সঙ্গে কিংশুকের পরিচয় করে দিলে। কিংশুক সমীরণ অনুষ্ঠিত উৎসবে এর আগে কখনও যোগদান করে নি। লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা কর্‌তে তার ভাল লাগ্‌তো না। আপনার সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়েই সে দিনরাত মাতাল হ'য়ে থাকে। সুতরাং তার কবিতা পাঠ করবার সৌভাগ্য অনেকের হ'লেও তাকে দেখবার সৌভাগ্য অতি অল্পজনেরই ভাগ্যে ঘটেছে। কিংশুককে এখানে দেখবার আশা কেউ করে নি—

সমীরণও না—কারণ সে ভেবেছিল, প্রতিবারের মত এবারেও কিংশুক অনুপস্থিত থাক্‌বে।

সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আসন গ্রহণান্তর পদ্মিনীর দিকে চেয়ে কিংশুক বললে, মাপ কর্ব্বেন, আপনাকে বাধা দিলুম। আপনি আবার আরম্ভ করুন।

সলজ্জহাস্যে পদ্মিনীর নব তৃণের মত শ্যামল মুখখানি ভরে উঠল। তরুণ কবির অনুরোধ সে প্রত্যাখ্যান কর্‌লে না, আবার ধীরে গাইতে সুরু কর্‌লে—

আলো যে গান করে মোর প্রাণে গো
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হ'ল কাহার খোঁজে।
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো

বেশ রাত্রি হয়েছিল। গান থাম্‌লে পর সমীরণ সকলকে খেতে আহ্বান কর্‌লে। খেতে খেতে আলোচনা চল্‌তে লাগলো।

কিংশুক যে টেবিলে বসে খাচ্ছিল সে টেবিলের আর দু'টি চেয়ারের একটা অধিকার করেছিল পদ্মিনী, অপরটি সমীরণের ভগ্নী অশোকা। পদ্মিনীর দিকে চেয়ে কিংশুক বল্‌লে, আপনার গান আমার খুব ভাল লাগলো।"

সলজ্জ হাস্যে পদ্মিনী মুখ নামালো। কিংশুকের ঠিক পাশের টেবিলেই বসে সমীরণ খাচ্ছিল। সে বল্‌লে, আপনি জানেন না মিস্ মিত্র, কিংশুক খুব ভাল গায়।—

—তাই নাকি? এতক্ষণ বলেননি তো আপনি? এক্ষুনিই কিন্তু শোনাতে হবে আপনাকে।

মৃদু হেসে কিংশুক বল্‌লে, খেতে খেতেই নাকি ?

ভোজন সমাপনান্তে সকলে কিংশুককে গান গাইবার জন্যে ধরে বস্‌ল। সে বাঁশী বেহালা বাজাতে ওস্তাদ, কিন্তু অর্গান কিংবা হারমোনিয়ম সে বাজাতে পারে না। অগত্যা শুধু গলাতেই সে গান ধর্‌লে——

এই লভিনু সঙ্গ তব—সুন্দর হে সুন্দর
ধন্য হল অঙ্গ মম, পুণ্য হল অন্তর।

* * * *

At home এর তিন মাস পরের কথা। বিকেল বেলা; অস্ত সূর্য্যের রক্তাভায় রাঙা সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম—তারই এক কোণে একখানি আরাম কেদারায় কিংশুক বসেছিল—দূর দিগন্তের পানে দৃষ্টি মেলে।

কিংশুকের ঠিক পাশেই একখানি সোফায় বসে' পদ্মিনী ও অশোকা। পদ্মিনী সেতার বাজাচ্ছিল। অস্ত সূর্য্যের রক্তাভায় তাহার মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরে পদ্মিনী সেতার থামালে। মুক্তার মত ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দুতে তার ক্ষুদ্র কপোলটি ভরে উঠেছে। ধীরে আইরিস্ লেসিনের রুমালখানি কপালে ঠেকিয়ে সে বল্‌লে, কি করি মশাই, কেমন লাগ্‌লো ?

সুর মাতাল গলায় পদ্মিনীর দিকে চাহিয়া কিংশুক বল্‌লে, চমৎকার আপনার শিক্ষা! অশোকা, তোমার বন্ধুটি একটী রত্ন !

দুষ্টামীর হাসি হেসে অশোকা বল্‌লে, আপনি চান তো রত্নটি আপ্‌নাকে দান কর্‌তে পারি। পদ্মিনীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। রেমব্রাণ্টএর আঁকা একখানা ছবির দিকে চেয়ে সে দাঁতে দাঁত চাপ্‌লে।

*
* *

ছ'মাস পরে শুন্‌তে পাওয়া গেল কিংশুক পদ্মিনীকে বিবাহ করেছে। বিবাহে-পাওয়া উপহার গুলির মধ্যে সমীরণের দেওয়া নরেন দেবের "ওমর খৈয়াম্" বইখানি ছিল। সমীরণ তাহার উপহার পৃষ্ঠায় লিখে ছিল—শুনেছি ভদ্রলোকের এক কথা। তাই বটে! কথা-প্রসঙ্গে একদিন বুক ঠুকে বলে ছিলে—"বিয়ে আমি করবোনা, কবি মানুষের ওসব সংসারের ঝঞ্ঝাট পোষায় না"—সেই কথাই রাখছো বটে!"

শ্রীশান্তা মিশ্র।

—দ্বারী-

চরিত্রগণ

দ্বারী

মন্দার

শিখা

ব্যাধ

বাউল

বালক

রুদ্র

নাগরিকগণ

রাজসৈনিকগণ

আশাপথবাহীগণ

ভূত, প্রেতগণ

[বিশাল সোণার মন্দিরের রূপার দ্বার রুদ্ধ। দ্বারে বৃহৎ তরোয়াল হাতে আপদমস্তক কালো পোষাক পরিয়া দ্বারী দাঁড়াইয়া আছে।]

(নীল পোষাক পরিয়া মন্দারের প্রবেশ।)

দ্বারী। কে যায়!

মন্দার। আমি মন্দার!

দ্বারী। কি চাই তোমার?

মন্দার। তুমি মন্দিরের দ্বার খোল, ভিতরে যাই।

দ্বারী। কি সর্ব্বনাশ, মন্দিরের দ্বার খুলব' কি?

মন্দার। হ্যাঁ, তোমায় খুল্‌তেই হবে।

দ্বারী। সে হবে না, আমাদের রাজার হুকুম নেই।

মন্দার। আমি তোমাদের রাজাকে জানি না, আমি ভিন্ন রাজার দেশ থেকে এসেছি।

দ্বারী। আমাদের রাজার নিয়ম ভাঙলে সারা জীবন বন্দী হয়ে থাক্‌তে হবে। মন্দিরের দ্বারে হাত দিলে এই তরোয়াল দিয়ে তোমার মাথা কেটে ফেল্‌ব'। দ্বারের আশেপাশে কি আছে দেখ্‌তে পাচ্ছ?

মন্দার। হ্যাঁ!

দ্বারী। কি বল দিকিন?

মন্দার। মড়ার হাড় আর মড়ার মাথা!

দ্বারী। এসব তাদেরই হাড় যারা দুঃসাহস ক'রেছিল মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে, ওদের কেউ বা তরোয়ালে মাথা দিয়ে ম'রেছে, কেউ বা মন্দিরের দ্বারে মাথা ঠুকে ম'রেছে, আর কেউ বা বন্দী হ'য়ে না খেতে পেয়ে ম'রেছে। সাবধান হ'য়ে থেকো বালক! মন্দিরের দ্বার খুলবার বুকের পাটা ক'রো না।

মন্দার। তোমরা মন্দিরের দ্বার খোল না কেন?

দ্বারী। এই আমাদের নিয়ম!

মন্দার। এমন নিয়ম করেছ কেন?

দ্বারী। তা জানি না।

মন্দার। সে কি?

দ্বারী। হ্যাঁ, আমাদের রাজবংশের জন্ম থেকেই এ নিয়ম চ'লে আসছে।

মন্দার। তোমাদের রাজত্ব কতদিন কার?

দ্বারী। সে অনেকদিনকার, কবেকার তা আমাদের মনে নেই, এর কথা আমরা চিরকাল শুনে আস্‌ছি।

মন্দার। তুমি এখানে কতদিন আছ?

দ্বারী। সারা জীবন ধ'রেই।

মন্দার। তোমার আগে এখানে কে ছিল?

দ্বারী। আমার বাবা।

মন্দার। তার আগে?

দ্বারী। আমার বাবার বাবা।

মন্দার। তার আগে?

দ্বারী। তার বাবা। এমনি ক'রেইত' আমরা চিরদিন পুরুষানুক্রমে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করে আসছি—এই আমাদের নিয়ম, এই আমাদের জীবন। যারা এই মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে আসে তাদের কোন ক্রমেই আমরা ক্ষমা করি না। আমরা কেবল আমাদের নিয়ম পালন করি, আমাদের রাজা সেই নিয়ম রক্ষা করেন!

মন্দার। এ অর্থহীন নিয়মে তোমাদের মনে কোন সন্দেহ হয় না?

দ্বারী। এই নিয়মটীকে বাঁচিয়ে রাখবার ঝোঁকেই ত আমাদের প্রাণ ভ'রে আছে। আমাদের এ পুরাতন নিয়ম কেউ ভাঙ্গতে এলেই আমরা চঞ্চল হ'য়ে উঠি।

মন্দার। আমাদের দেশে এ সবের কোন বালাই নেই।

দ্বারী। যাও, আর বেশী কথা কয়ো না, আমি আমার কাজে মন দিই।

[দ্বারী স্থির হইয়া তরোয়াল কাঁধে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিল এবং মন্দার সম্মুখে বট গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রহিল।]

(সবুজ পোষাক পরিয়া তীর ধনুক হাতে ব্যাধের প্রবেশ।)

মন্দার। তুমি কে?

ব্যাধ। আমি ব্যাধ!

মন্দার। কোথায় যাচ্ছ?

ব্যাধ। তীর ধনুক হাতে বাঘ শিকার ক'রতে যাচ্ছি।

মন্দার। মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে যাবে না?

ব্যাধ। না।

মন্দার। কেন?

ব্যাধ। সে সাহস নেই।

মন্দার। তুমি এমন বীরপুরুষ হ'য়ে একথা বল্‌ছ?

ব্যাধ। তা কি ক'র্‌ব' বল! আমাদের নিয়ম-মন্দিরের দ্বার চিরকাল বন্ধ হ'য়ে থাক্‌বে। শুধু গায়ের জোরে তাকে কেউ কোনদিন খুল্‌তে পার্‌বে না। আমাদের কেবল গায়ের জোরই আছে।

মন্দার। তবে কিসে খুল্‌বে?

ব্যাধ। তা জানি না, আমরা ও নিয়ে মাথা ঘামাই না।

[ব্যাধের প্রস্থান ও অন্যদিক হইতে হল্‌দে পোষাক পরিয়া একতারা বাজাইতে বাজাইতে বাউলের প্রবেশ।

মন্দার। তুমি কে?

বাউল। আমি বাউল!

মন্দার। তুমি কি কর?

বাউল। আমি এই একতারা নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে যাই। আমরা উদাসী, আমরা কোথাও বদ্ধ থাকি না।

মন্দার। মন্দিরের দ্বার খোল্‌বার গান তুমি গাওনা কেন?

বাউল। আমরা নিয়মের ভাঙাগড়া নিয়ে মাথা ঘামাইনা।

মন্দার। ছিঃ!

বাউল। তা কি করব' বল. আমাদের ও সব ভাল লাগেনা।

[বাউলের প্রস্থান ও গাহিতে গাহিতে গোলাপী
গোষাক পরিয়া বালকের প্রবেশ।]

মন্দার। এস. এস তুমি কে, মন্দিরের দ্বার ভাঙতে এসেছ?

বালক। না।

মন্দার। তবে?

বালক। আমরা খ্যাপার সাথী. আমরা ভাঙতে আসি নি, আমরা ভাসতে এসেছি। ভেসে ভেসে আমরা কোথায় চ'লে যাব তা কে জানে। আমাদের ভেসে যাওয়ার পথে তোমার দেখা পেয়েছি, এ দেখাটুকু আমাদের মনে চিরদিন আঁকা থাকবে। তুমি ভাঙতে এসেছ. ভাঙতে থাক।

বালকের গীত।

খ্যাপা সে বাঁধন খুলে যায়,
নীল আকাশে নয়ন মেলে আপন মনে চায়।
সোণার আলোর পাল তুলিয়ে
চলে তরী কেবল বেয়ে,
ঢেউয়ে নাচে হেলেদুলে কোথায় ভেসে যায়।

[গাহিতে গাহিতে বালকের প্রস্থান।]

মন্দার। আমার হাত পা কেবল সড়সড় করছে মন্দিরের দ্বার ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলবার জন্ত।

[লাল পোষাক পরিয়া একহাতে ত্রিশূল ও অন্যহাতে মালা লইয়া গাহিতে গাহিতে শিখার প্রবেশ।]

শিখার গীত

দুয়ার দিওনা, ওগো নিত্য আনাগোনা,
বেদনাতে গর্জ্জি উঠে, নয় ত ছলনা!
পথের সাথী যে রে
সে ত' মরণ-পারাবারে
বাঁধন টুটে, বেড়ায় ছুটে এমনি আন্‌মনা!
শিকল ভাঙ্গার ধ্বনি বাজে, বাজে ঝন্‌ঝনা!
ওগো দুয়ার দিওনা!

মন্দার। তোমার ডান হাতে ও কি?

শিখা। এ শঙ্করাজের মালা। যে আমার সাথী হবে তার গলায় এই মালা পরিয়ে দিব। তুমি আমার সাথী হতে পার্‌বে?

মন্দার। হ্যাঁ পার্‌ব!

শিখা। ঠিক্ বল্‌ছ?

মন্দার। হ্যাঁ!

শিখা। ঠিক?

মন্দার। হ্যাঁ!

শিখা। ঠিক্?

মন্দার। হ্যাঁ!

শিখা। বেশ, তুমি তিন সত্য করেছ, তোমার গলায় তবে মালা পরিয়ে দি। [মন্দারের গলায় মালা পরাইয়া দিল।]

মন্দার। তোমার বাঁ হাতে ও কি?

শিখা। এ ত্রিশূল, এতে আগুন জলে, সব বাঁধন পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, এই নাও তুমি ত্রিশূল!

মন্দার। তুমি ত' আমার সব দিয়ে দিলে, তোমার তবে কি রইল?

শিখা। কেন, তুমিতো আমার রইলে!

মন্দার। এখন তবে আমরা কি কর্‌ব?

শিখা। এই ত্রিশূলের ঘা মেরে আমরা মন্দির পুড়িয়ে দোব, তুমি কি জান না ও মন্দির একবারে ভুয়ো, ওরা মিথ্যা ক'রে ওকে আঁকড়ে ধরে আছে, শুধু আমাদের ভবিষ্যতের প্রাণের ধারাকে বাধা দিচ্ছে।

মন্দার। আমিও ত' মন্দির ভাঙতে এসেছি।

শিখা। সেই জন্যই ত' আমাদের মিলন হ'ল।

মন্দার। কিন্তু কেমন ক'রে ওখানে যাবে? দ্বারী যে বলেছে ওখানে গেলে আমাদের মেরে ফেল্‌বে?

শিখা। তবে তুমি আমায় ভালবাস্‌লে কি কর্‌তে? যারা ভালবাসে তারা মরে না, এ ত্রিশূল তাদের হাতে দাউ দাউ ক'রে জ'লে উঠে—এর কাছে তুচ্ছ ঐ মন্দির! যে জানে ভালবাস্‌তে সে ত সারা পৃথিবীর বুকে আগুন জ্বলিয়ে দেয়, তাতে সব মিথ্যা পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

উভয়ের গীত।

ভাঙ্‌-ভাঙ্‌-ভাঙ্‌
ওরে গর্জ্জন গান!
রুদ্র-বিষাণ বাজে সন্‌ সন্‌
তাণ্ডব ঐ তান!

আয় আয় সব ছুটে
প্রাণধন নে রে লুটে,
প্রাণের সাড়ায় প্রাণ পাবি সবে
প্রাণ কর আজি দান!
এই ভাঙনের গান!

[কোলাহল করিতে করিতে সাদা পোষাক পরিয়া
নাগরিকগণের প্রবেশ।]

নাগরিকগণ। হা রা রা রা, ভাঙ, ভাঙ, মন্দির ভাঙ, মন্দির ভাঙ—

[অন্যদিক হইতে কালপোষাক পরিয়া
রাজসৈনিকগণের দ্রুতপদে প্রবেশ।]

রাজসৈনিকগণ। সাবধান! সাবধান!

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ এবং কতিপয় নাগরিক ও রাজসৈনিকগণের পতন ও মৃত্যু ও বাকী সকলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।]

দ্বারী। মন্দিরের দ্বারের কাছে যে আস্‌বে তার মৃত্যু!

[তরবারি ঘুরাইতে লাগিল।]

শিখা। চল আমরা একপাশে দাঁড়াই গে।

মন্দার। কেন?

শিখা। এখনও আমাদের সময় হয় নি। যখন ওদের চারিদিকে আঁধার ঘনিয়ে আস্‌বে আর আকাশে কালো মেঘের বুকে চকমক ক'রে বিজলী চমকে উঠ্‌বে, তখন এই ত্রিশূল জল্ জল্ করে জল্‌বে।

[ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ দেহ ভূত-প্রেতগণের সহিত শুভ্রদেহ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ও গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

গীত

তা তা থেই থেই থেই
ভেঙ্গে চল্, ভেঙ্গে চল্,
হা হা হা হা হা;
ত্রিশূল জ্বল্, ত্রিশূল জ্বল্!
কড় কড় কড় বাজ
ভেঙ্গে পড়ুক আজ,
রুদ্র আগুণ জ্বলুক দ্বিগুণ
জ্বলুক ধরাতল,
হা হা হা, জ্বলুক ধরাতল!

[প্রস্থান।]

[ঘোর অন্ধকার ও ঘন ঘন বজ্রপতন।]

শিখা। এইবার আমাদের সময় হ'য়েছে, ত্রিশূল জ্ব'লে উঠেছে!

দ্বারী। ওঃ আজ কি দুর্য্যোগ, আমাদের মন্দির কাঁপ্‌ছে!

শিখা। মন্দার!

মন্দার। শিখা!

শিখা। এইবার!

উভয়ে। (উচ্চৈঃস্বরে) জয় ত্রিশূলের জয়!

[উভয়ে ক্রতপদে মন্দিরে ত্রিশূলের আঘাত করিল এবং মন্দির জ্বলিয়া উঠিল।]

দ্বারী। কে, কে, কে, সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল. আমাদের মন্দির গেল, গেল, গেল— [মন্দিরের দ্বারে লম্বা হইয়া পড়িয়া গেল।]

[কোলাহল করিতে করিতে কাল পোষাক
পরিয়া রাজসৈনিকগণের প্রবেশ ।]

রাজসৈনিকগণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর, মন্দির রক্ষা কর, রাজা মশাইকে খবর দাও, রাজা মশাইকে খবর দাও, দ্বারী, দ্বারী—

[মন্দিরের সম্মুখে একে একে পতন ও মৃত্যু ।]

মন্দার। শিখা ! আমার গা জ্বলে গেল ! কি আগুন !

শিখা। আমিও জ্বল্‌ছি, মন্দিরও জ্বল্‌বে, আমরাও জ্বল্‌ব। আগুনের সোঁ সোঁ শব্দের ভিতর নব জীবনের সঙ্গীত শুন্‌তে পাচ্ছ ?

মন্দার। হ্যাঁ, কি মধুর ! আঃ–! (পতন)

শিখা। মন্দার ! মন্দার ! নূতন সৃষ্টি, নূ—ত—ন—সৃ—ষ্টি !
(পতন)

[উভয়ের মৃত্যু ।]

(পট পরিবর্ত্তন ।)

[শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম হাতে নানারঙের পোষাক পরিয়া আশাপথ বাহীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।

গীত

নাচে জীবন রে, নাচে জীবন রে !
কভু রুদ্ররূপে, কভু মধুর রে,
কভু ছন্দ বাজে, কত রূপ সাজে,
কত নর্ত্তন মর্ত্তন তর্জ্জন রে !

ঐ প্রভাত রে, ঐ আঁধার রে,
ঐ বজ্রনাদে ঐ মত্তমদে,
ঐ মিথ্যা মাঝে ঐ সত্যরাজে,
প্রিয় জীবন রে, ওরে জীবন রে,
আয় আয় ছুটে আয় জীবন রে !
অনাদি পথের পথিক রে,
প্রাণের ধারা রে, প্রাণের ধারা রে !

যবনিকা

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ঘোষ ।

—চিত্রকর-

সতীশ ছবি আঁকে, আর্টস্কুলের ভূতপূর্ব এক কৃতী ছাত্র। আঁকতে পারে ভালো, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হ'তে না হ'তেই যথেষ্ট নাম হয়েছে; অনেক সম্পাদক সতীশের ষ্টুডিওতে যাতায়াত করে থাকেন, কেউ চান প্রচ্ছদপট আঁকাতে, কেউ চান ভিতরের রঙীন্ ছবি, কেউ চান ব্যাগারে কাজ মিনি পয়সায় আর কারো বা ইচ্ছা সস্তায় কিস্তিমাৎ করা। কিন্তু যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সে লোকটা এই সব খরিদ্দারকে নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামায় না! সে হচ্ছে কিছু খামখেয়ালী গোছের লোক এবং নিজের ঘরে বসে এঁকে যায় চিত্রের পর চিত্র কত বিচিত্রভাবে, কত রঙের খেলা খেলে যায় ক্যাম্বিসের উপর তার নিপুণ তূলির স্পর্শে। সতীশ সাধারণের কাছে তার ষ্টুডিওর পরিচয় দেয় 'কারখানা' বলে। এই কারখানা নামে অভিহিত চিত্রশালাটি অবস্থিত হচ্ছে একটা সরু গলির মধ্যে একটা ভাঙা গোছের বাড়ীর ওপরের ঘরে। ভাঙা পোড়ো বাড়ী! কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে তার মধ্যে এত ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে সকল লোকের চোখের আড়ালে। সহরের লোক তার ঘরে ঢুক্‌লে মনে করে এ কোন স্বপ্ন-পুরীর মধ্যে এসে পড়লুম।

এই স্বপ্ন-পুরীর মালিক সতীশের বাপ-মা ছিল না, ছেলেবেলা থেকেই মামার বাড়ীতে মানুষ সে। যখন স্কুলে যেত তার অ, আ চিন্‌তে লেগেছিল বড্ড বেশী সময়, কিন্তু বইয়ের দু'তিন পাতা পড়া হতে না হতেই দেখা যেত বইয়ের সব ক'খানা পাতা পেন্সিল এবং কালীতে

আঁকা নানারকম কুকুর বেড়ালছানা এবং ফলেফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে। অবশেষে যখন দেখা গেল যে অনেক চেষ্টার পর পড়াশুনা একরকম এগুতেই চায় না এদিকে আঁকড়িজুকড়ি আঁকার দিক দিয়ে হাত একেবারে পেকে উঠছে তখন মামারা তাকে আর্টস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। এই হ'ল তার বাল্যের ইতিহাস।

এখন সতীশ তন্ময় হ'য়ে থাকে তার ছবির ধ্যানে; অন্য কোনো জিনিষ তার মাথায় ঢোকে না এবং সেও বাইরের কোনো জিনিষ নিজের মাথায় ঢোকাবার প্রয়োজন বোধ করে না।

(২)

সতীশকে তার যে কটি আপনার লোক ছিল সবাই ধরে পড়লো বিয়ে করতে হবে। সতীশ নিজের আপত্তি জানালে—তার জীবনের কোনো কিছুর স্থিরতা নেই, সে একজন নতুন লোককে অনর্থক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারে ঢুকিয়ে কষ্ট দিতে পারবে না ইত্যাদি বলে। কিন্তু পীড়াপীড়ি করে তার অনেক কল্পনা নষ্ট করে এবং বহুবার শান্তি ভঙ্গ করে সতীশকে রাজী করানো হ'ল। তাকে জানানো হ'ল বাঙালীর ঘরের ছোট খুকীরা ভারী শান্ত মেয়ে হয় এবং একটি ছোট মেয়েকে তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল।

প্রথম. প্রথম সতীশের বিয়ে হ'ল কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, সে এইখানেই তার ছোট্ট পত্নী কমলার প্রতি সব কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে মনে ক'রে আবার ছবির রাজ্যে ফিরে গেল। আর কমলাও নিজেকে পুতুল খেলার মধ্যে নিমগ্ন ক'রে দিলে। এমনি ভাবে দিন যেতে যেতে একদিন সতীশের মনে হ'ল তার দিনগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে চলেছে, খানিকটা বৈচিত্র্য দরকার, স্ত্রীকে নিয়ে, স্ত্রীর সঙ্গলাভ ক'রে নিজের ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করলে কিন্তু বালিকা স্ত্রী তার নবোদগত

প্রেমগুঞ্জনে সাড়া দিলে না, মনে করলে খেলার মাঝখানে একি আপদ এসে জুটলো। এদিকেও সুবিধে হ'ল না দেখে সতীশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠলো।

তারপরে কোনো একদিন এক সঙ্গীর সঙ্গে গিয়ে প্রতিমার সঙ্গে সতীশের আলাপ হ'ল। প্রতিমা রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী। একাধারে রূপ রসও সঙ্গীতের এ রকম মন্দাকিনী ধারা দেখে অনভ্যস্ত সতীশের নয়ন-মন একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল! তার ছবির দেবতার উপাসনা থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এই নতুন উপাসনার হাতে ছেড়ে দিলে। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলে যে এর হাতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দিলেও অর্থের প্রয়োজন একেবারে শেষ হয় নি। কাজেই মাঝে মাঝে তুলি টুলি ঝেড়ে নিয়ে দিনান্তে সতীশকে একবার বসতে হ'ত। প্রতিমাকে মডেল ক'রে কতকগুলো ছবি এঁকে আবার কিছু নামও হ'ল, কারণ প্রতিমার রূপও কম ছিল না।

(৩)

যখন কমলার পুতুল খেলার সখ মিটে গেছে, চোখ খুলেছে তখন সে দেখলে তার ঘর শূন্য। বঙ্গনারীর সর্ব্বস্ব ত'ার স্বামী দুদিন তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এসে এখন কোথায় কত যোজন দূরে সরে গেছে। কত রাত্রি এখন তার কাটে বৃথা আশায় পথ চেয়ে, মনে পড়ে ছেলেবেলার ঘুমপুরীর রাজকন্যার কথা। রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে সারাপুরীতে একলা, অত বড় বিরাট রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে, কেউ কোথাও নেই শুধু রাজ কন্যা ঘুমিয়ে আছে কত যুগযুগান্তরের আশা নিয়ে তার বুকের ভেতর। চোখের পাতায় রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে, নিঃস্পন্দ লুটিয়ে-পড়া ঘুমন্ত দেহ কিন্তু তার ভিতরেও সেই মিলনের আশা জেগে আছে। কিন্তু শেষে রাজপুত্তুর এসে সোণার

কাঠির পরশ দিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। আর কমলার কি এই দিনের পর দিন প্রতীক্ষা ক'রে থাকা বৃথাই হবে! এমনই সব কত কথা মনে আসে রাতে শুয়ে শুয়ে। কখনো মনে পড়ে ছেলেবেলার সঙ্গিনীদের কথা, তাদের সকলেরই এখন বিয়ে হয়ে গেছে। এক সময়ে দূরপল্লীতে কজনে মিলে খেলা হত বউ বউ, পুতুলের বিয়ে—যেন সব সত্যিকারের ঘরকন্না। তারপর সে খেলাঘর ভেঙে গেল যখন একে একে সকলের বিয়ে হ'য়ে গেল এবং খেলাঘরের বদলে জীবন্ত সংসার গড়ে উঠ্‌লো সব দূরে দূরে। আর কারো সঙ্গে কারো বিশেষ দেখা হয় না। কিন্তু তার—তার এরকম হ'ল না। শুধুই পথ চেয়ে থাকা, শুধু উপাধান চোখের জলে ভেজানো রাতের পর রাত। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে লোক মুখে বা মাসিক পত্রের পাতায় সতীশের ছবি বা তার ছবির প্রশংসার গর্ব্বে কমলার বুকখানা ভরে ওঠে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়ে যায় এতে তার গর্ব্বের কি আছে। সতীশ কে তার? কই, কেউ নয় তো! কোন এক ভুলে-যাওয়া দিনে, সে কথা আজ মনে পড়ে কি না পড়ে, অনেক বাঁশী আলো, আশা আনন্দের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু তার পর থেকে এ লোকটির অস্তিত্ব মনে করবার আর কারণ ঘটেছে কি? শুধু দূরাগত খারাপ খারাপ খবর পেয়ে মনটা খালি ব্যথাতেই ভরে উঠেছে। আচ্ছা তার জীবনটা এই স্বামী ব'লে লোকটার সম্পর্ক থেকে, স্মৃতি থেকে কি একেবারে বিমুক্ত, বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শুধু তার নিজেকে নিয়ে গড়ে তোলা যায় না! যেখানে আর কেউ থাক্‌বে না, থাকবে শুধু সে আর সে! নাঃ, তা আর কি করে হবে। এ যে শোনা যায় জীবন মরণের সম্বন্ধ! কিন্তু একটা কথা, এই যে লোকটার সঙ্গে তার কত বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে, তার সারা অঙ্গে যৌবনের হিল্লোল বহে চলেছে, সে যে

দেবতার কাছে নিবেদন করবার ফুলের মত পথ চেয়ে বসে আছে কিন্তু কই এ ত একবার ফিরেও চায় না। অথচ একি তার জন্মজন্মান্তরেও স্বামী হ'বে? দূর! তা অসম্ভব! আর যদি তা' হয় তা' হ'লে বুঝতে হবে এটা বিশ্ববিধাতার অবিচার বা তার ওপরে একটা বিরাট অভিশাপ আছে।

(৪)

তারপর একদিন সবাই দেখে কমলার মুখে আর হাসি ধরে না, শুকনো মুখ আজ অন্তরের আনন্দ আভায় উজ্জ্বল! সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল কিন্তু মুখে কেউ কিছু বল্লে না কারণ সবাই তার জীবনের করুণ কাহিনী জানতো। খালি তার মামাত ননদ বল্লে, হ্যাঁলা, মরতিস মুখ শুকিয়ে, রাত কাটাতিস সবার চোখের আড়ালে কেঁদে কেঁদে, আজ আবার পোড়ার মুখে হাসি ফুটলো কোথা থেকে। তবে কি দাদার মন ফিরলো, দাদা কি তোর শ্রীচরণে মজলেন।

কমলা হেঁসে বল্লে 'দূর তা' কেন, তেমন কপাল কি করেছিলুম ভাই; তা নয় তবে ভেবে দেখলুম যে একজন ত দিব্বি আরামে কাটাচ্ছে তবে আমিই বা কষ্ট করে মরি কেন। সারা রাত্তির কেঁদে কাটাই এ সব কিন্তু ভাই তোর বানানো কথা বরং তুই একদিন রাত্তির বেলা আমার কাছে শুয়ে দেখিস্।'

একদিন কমলা বাড়ীর একটি ছোট মেয়েকে দিয়ে সতীশের কাছে তার ষ্টুডিওর চাবি চেয়ে পাঠালে। সতীশ একটু অবাক হ'য়ে গেল। কারণ কমলার যা প্রাপ্য সতীশ কোনো দিন তাকে তা দেয় নি আর সেও এই অন্যায় বিচার মাথা পেতে নিয়েছে মুখটি বুজে, কোনো দিন কোনো আপত্তি করে নি। আজ তবে সে ছবির ঘরের চাবি চেয়ে বসলে' কেন? একবার ভাবলে জিজ্ঞাসা করবে, কি দরকার। তারপর

ভাবলে এম্নি দিয়ে দেওয়াই ভালো, যাকে কখনো কিছু দিই নি এমন কি সম্বন্ধ পর্যান্ত স্বীকার করিনি সে যদি একদিন এটুকু অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট হয় ত তাই হ'ক, চাবিটা ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল সতীশ।

দুপুর বেলা ফিরে তার একটু আঁকবার ইচ্ছা হল, চল্লো সে ষ্টুডি-ওর দিকে। ষ্টুডিওর সামনে এসে দরজা খোলা দেখে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল, মনে ছিল না সকালে কমলা চাবি চেয়ে নিয়েছে। ঘের ঢুকে দেখে কমলা আনমনে ছবি দেখছে, মাথার কাপড় খোলা, উদাস চাহনি,একটু এলোমেলো ভাব ! সতীশ বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে রইলো কমলা সতীশকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় তুলে দিলে, মুখে তার লজ্জারুণ রাগ ফুটে উঠলো। সতীশ অপলকনয়নে চেয়ে রইলো কমলার দিকে, আজ হঠাৎ মনে হ'ল কমলা ভারী সুন্দর ! কিন্তু তবু সঙ্কোচ কাটাতে পারা যায় কৈ ? এতদিনের ব্যবধানে তাদের মাঝখানে যে একটা মস্ত বড় চীন প্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে সরিয়ে দেবে কে ?

(৫)

কিন্তু এ সব কিছুই করতে হ'ল না। কমলা মাঝে মাঝে ষ্টুডিওর চাবি চেয়ে নিত। একদিন সন্ধ্যায় ষ্টুডিওতে যাচ্ছিল বাড়ীর সামনে সতীশ দেখলে অনেকগুলো লোক জমা হয়েছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে আস্‌ছিল হঠাৎ এতগুলো লোক তারই ঘরের কাছে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো। কাছে গিয়ে দেখলে কমলা পড়ে আছে আর পথের অনেক খানি তার রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মাথাটা ঘুরে উঠলো, সেইখানে দেয়াল ধরে' দাঁড়িয়ে একটু সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা আম্বুলেন্স ডেকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে কমলাকে। শিয়রে তার সতীশ তিনটি রাত অনাহারে অনিদ্রায় আচ্ছন্নের মত বসে রইলো। কিন্তু

কমলা একটি বারের জন্যও চোখ খুলে চাইলে না, তারপর সব শেষ হ'য়ে গেল।

তারপর থেকে সবাই দেখ্‌তো ষ্টুডিও বন্ধ থাকে, খরিদ্দার এসে ফিরে যায়, চিত্রকরের পাত্তা নেই। সতীশ বাড়ী যায় না তাই সবাই বাড়ী থেকে খবর নিতে এল, দরজা খুলে তার মামাতো বোন্ দেখলে বড় একটা নতুন ছবি আঁকা রয়েছে, ঠিক যেন কমলা শুয়ে রয়েছে, তার শিয়রে মৃত্যুদূত নেমে আস্‌ছে আর তার সাম্‌নে শিল্পী বসে আছে চুপটি ক'রে তুলি হাতে নিয়ে। মামাতো বোন্‌কে দেখে সতীশ বল্‌লে, কমলা আর পালাতে পার্‌বে না রে। আর তার সঙ্গে তার অট্টহাস্যে সারা বাড়ীখানা ভরে উঠ্‌লো। সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রেতের মত পাগলের এই অট্টহাসি শুনে সকলের বুক ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লো!

শ্রীসুধীন্দ্র কুমার দেব।

—আদেশ—

কুশল ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তাঁহার দান ধ্যান, ক্রিয়া কলাপ, মান সম্ভ্রম দেখিয়া সারা দেশের লোক মনে করিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভাগ্যবান পুরুষ এবং ধনে পুত্রে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইয়াছে। কিন্তু তিনি লোকান্তরে গমন করিলে সেই পোড়া দেশের লোকই তাঁহার শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খাইয়া গিয়া অযাচিতভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল—ভট্চাযের ছিলনা বিশেষ কিছুই। থাকিবার মধ্যে ছিল মাত্র একখানা বাড়ী; পাওনাদারকে ফাঁকি দিবার জন্য সেখানিও বিক্রয় কোবালা করিয়া তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে দিয়া গিয়াছেন। সে কারণে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পথের কাঙ্গাল হইয়াছে।

জনরবের সহস্র জিহ্বায় স্থান পাইয়া মন্তব্যটা শেষে এমন আকার ধারণ করিল যে তাহা শুনিয়া কুশল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাদেবকে মনে মনে বলিতে হইল—"বসুন্ধরে দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।" মহাদেব তাহার কনিষ্ঠ সহোদর মহেন্দ্রদেবকে একদিন একাকী পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"—এ কি শুন্‌ছ ভাই ?"

বিস্ময় ভরিত নেত্রে মহেন্দ্রদেব প্রতি জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের কি দাদা ?"

"এই বাবার শ্রাদ্ধের কথা—বাড়ী বিক্রয়ের কথা—"

অপ্রসন্ন ... মহেন্দ্রদেব কহিল—হাঁ, সেত সবই ঠিক্ কথা। তুমি কি জান ... ?

—"কিছুই না। যা'ক্ তা'তে আর হয়েছে কি ? তা' হ'লে ঋণের কথাও সত্য ?"

"—মৃত্যুর মতই সত্য। ধরচে লোকের যা' হয়ে থাকে, ভাই। বাড়ীটা যদি রক্ষা করতে পারা যায়, এই ভেবেই টাকাটা অন্য জায়গা থেকে জোগাড় ক'রে—" "কৈফিয়ৎত চাচ্ছিনা ভাই। কেবল জিজ্ঞাসা করছি' বাড়ীই যদি বিক্রি হ'ল, বাবার ঋণ শোধ হ'লনা কেন ?"

অভিজ্ঞতার অভিনয় করিয়া খুব গম্ভীর ভাবে মহেন্দ্র কহিল—"বাব ঋণ—অনন্ত, তাঁর আর শোধ হ'বে কেমন ক'রে বল দাদা ? তবে বাড়ীখানা যে আট্‌কে রেখেছি, সে কেবল বুদ্ধি ক'রে !"

আপনার মাথার দীর্ঘ কেশগুলা একটু জোর করিয়াই টানিতে টানিতে মহাদেব বলিল—

—"ও বুদ্ধিটা খুব সুবুদ্ধির পরিচয় নয় মহেন্দ্র ! পিতৃঋণ, বুঝেছ—পিতৃঋণ"—মহাদেব আর কথা কহিতে পারিল না। কাজল মেঘের বাদল ধারার মত তাহার চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু বহিতে লাগিল। মহেন্দ্র দেবের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছিল, সেই প্রসঙ্গে সে আরও কিছু বক্তৃতা করে। কিন্তু মহাদেবের অবস্থা দেখিয়া তাহা করিতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

(২)

আশ্বিন মাস—এবার মাসটা পড়িতে না পড়িতেই মহাপূজার আয়োজন চলিতেছে। মহাদেবের পুত্র সরলকুমার কলেজ হইতে আসিয়া পিতার ঘরে ঝড়ের মত প্রবেশ করিয়া কহিল—

—"বাবা, কলেজ বন্ধ হচ্ছে ৫ই, কলেজের মাহিনা আর জরিমানার টাকা কাল একটার মধ্যে জমা না দিলে নাম কাটা যা'বে ।"

আবিষ্টের মত খানিকক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিল—

—"কেন, তোমার কাকাবাবু মাইনে দেন নাই ?"

—"না, বলেছেন—টাকা কড়ির যেরকম অবস্থা, তা'তে এবার পূজোর কাপড় চোপড়ই হ'বেনা ত, কলেজের মাইনে।"

—"তা' হ'লে নাম কাটা যাওয়াই ভাল।"

—"আপনি কি বল্‌ছেন বাবা!"

—"ঠিক্ বল্‌ছি ধন, তুই সে কথা বুঝ্‌তে পারবিনি। যে লেখাপড়ায় মানুষ তৈরী হয়না সে লেখা পড়া নাই বা হ'ল। তার চেয়ে কোদাল পেড়েও যদি সংসারে সুখ শান্তি আন্‌তে পারা যায়, সেটা লক্ষগুণে ভাল।"

পুত্র বিরক্ত হইয়া পিতাকে বলিল—

—"আপনি কখন যে কি বলেন বাবা, আমি কিছুই বুঝতে পারিনা।"

মহাদেব হাসিয়া বলিল—"খাঁটিকথা বুঝা একটু শক্ত বাবা। সেদিন যখন এসে বলেছিলি, একটা উৎসব গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে গিয়ে তোর ধোপ দুরস্ত কাপড় চোপড় ছিলনা ব'লে আহ্বাহক তোকে অতিথির প্রাপ্য সম্মান দেয় নাই, সেদিনও একথা ব'লে ছিলাম, আর আজও তাই বল্‌ছি—"

পিতৃদেবকে কথা শেষ করিতে না দিয়া পুত্র উত্তেজিতভাবে কহিল—"শুধু তা'রা কেন, কাকাবাবুর ছেলে অবনীও তো হাজার কথা কয়েছিল।"

—"হুঁ, সে কথাটা ঠিক্ আমার জানা ছিলনা। তা দ্যাখ্ রে সরল, তুই যদি কখনো মানুষ হ'স, তা' হ'লে ঐ ছেঁড়া তালি দেওয়া ময়লা কাপড়ের ভিতর দিয়েই হবি। যাঁরা তা' হয়েছেন, তাঁদের বাপ্ মায়ের কাররই ছেলে পুলেকে কাপুড়ে বাবু ক'রবার সঙ্গতি ছিল না। বুঝ্লিরে?"

হাতের বইখাতা টেবিলের উপর জোরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মুখখানা কাল মেঘের মত করিয়া সরলকুমার বলিল—"তা' না হয় বুঝ্লাম্। কিন্তু কলেজের মাইনেটা না দিলে ত নাম কাটা বন্ধ থাকবেনা।"

সে কথার উত্তর না দিয়া মহাদেব, মহেন্দ্র দেবের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার পর দিবসে কলেজের বেতন যখন সরলের হাতে দেওয়া হইল, তখন মহাদেব বলিয়া দিল—"কলেজের মাইনেটা হ'ল বটে, কিন্তু এবার পূজার কাপড় চোপড় হ'বে না।"

(৩)

মহেন্দ্রদেব উকীল। পূজার ছুটীর পরে আদালত খুলিলে সে লক্ষ্য করিল—তাহার অগ্রজ প্রায় প্রতিদিনই একজন নামজাদা উকীলের সেরেস্তায় যাতায়াত করিতেছে। ব্যবহারজীবের শাস্ত্র বিচার করিয়া তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না—তাহার দাদাটী এবার একটা কিছু গোলমাল বাধাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মহেন্দ্রের ভয় হইল—হাকিমের বিচারে যদি সাব্যস্ত হয়, যে বাড়ীখানা মৃত পিতার নিকট হইতে সে কোবালা করিয়া লইয়াছে, তাহা জাল বা সাজস্, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ। তাহার পর ওকালতী করিয়াও মহেন্দ্রদেব বিস্তর টাকা ও সম্পত্তি করিয়াছে। মহাদেবের সহিত একান্নবর্ত্তী সংসারেও সে বাস করে। আদালত খাতা পত্র দেখিলেই সে কথা সহজে

প্রমাণ হইয়া যাইবে। পাড়ার লোকও মহাদেবের পক্ষ হইয়া সেই কথাই আদালতে বলিয়া আসিবে। তখন সম্পত্তি চুল চিরিয়া বখ্‌রা হওয়া ভিন্ন ত আর উপায় থাকিবে না।

মহেন্দ্রদেব চিন্তার সমুদ্রে পড়িয়া গেল। সে একবার ভাবিল—কিছু টাকাকড়ি দিয়া দাদার সহিত ব্যাপারটা সে মিটাইয়া লয় কিন্তু বিত্তই যাহার সর্ব্বস্ব, এরূপ সহজ ভাবে মিটমাট করা তাহার পক্ষে সহজ নহে; বিশেষ, অবনী বিলাসিতার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া সে সময়ে যে ভাবে টাকার শ্রাদ্ধ করিতেছে, তাহাতে টাকা দিয়া দাদার সহিত মিটমাট করিতে মহেন্দ্রের একবারেই মন সরিল না। তখন সে আইনের ব্যাসকূটের বিচার করিতে বসিল। কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া অগ্রজকে সে মনে মনে খণ্ড বিখণ্ডিত করিতে লাগিল। পত্নীর পরামর্শ লইয়া তবে সে রাত্রে তাহার নিদ্রা হয়। পত্নী পরামর্শ দিয়াছে—"দেখা যাক্‌না, কত দূরের জল কত দূরে গড়ায়।" জল কিন্তু একেবারেই গড়াইল না। মাসখানেক পরে মহাদেব কাশীধামে অন্নপূর্ণা ক্ষেত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল—সরল ও সরলের মাতাও সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপত্তি করে নাই। মহাদেবের উকীল মহেন্দ্রদেবকে একখানা রেজেষ্টারী দলিল পাঠাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে লেখা ছিল, মহাদেব সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে বলিতেছে, মহেন্দ্র দেবের সম্পত্তিতে তাহার বা তাহার পুত্র সরলকুমারের অথবা সরলকুমারের ভবিষৎ বংশধরগণের কোনই অধিকার নাই।

মহাদেব আর ফিরিল না। মহেন্দ্রদেব অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেবলই ডাকিতে লাগিল—দাদা ফিরে এস, দাদা ফিরে এস।

কিন্তু মহাদেব সে কথা কাণেও তুলিল না। সরলকুমার বহুকাল পরে আর এক শারদীয়া উৎসবকালে একবার আসিল বটে—তখন

মহেন্দ্রদেব, পুত্রের অপরিণামদর্শিতার ফলে নিঃস্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল আর অবনীকুমার দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী। ব্যবসায় বাণিজ্যে সরল লক্ষীলাভ করিয়াছিল। মহাদেবের আদেশ হইল—সরল কুমারই তাহাদের ভরণ পোষণ করিবে। সরলকুমার সে আদেশ মাথা পাতিয়া লইল।

শ্রীমৃণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

-ব্যর্থ বর্ষা-

এবার আমার বর্ষা গেল
এম্‌নি নিরানন্দ রে !
শুধু বিফল ছুটে' ছুটে'
বাহিরে আর অন্দরে।
শুধু—কেবল নদীর পানে,
চেয়ে কেঁদে অধীর প্রাণে,
আকুল আশায় প্রতীক্ষাতে
যামিনী-দিন ধ্যান করে'——
এবার আমার বর্ষা গেল,
এম্‌নি নিরানন্দ রে।

কত তরীই এল গেল
পাল তুলে,' আর হাল ধরে',
কত বাঁশীই কত হাসিই
জাগ্‌ল নদীর কূল ভরে ;
রইনু বসে আসার আশায়,
চোখের জলে বুক ভেসে' যায়,
হায় হায় হায়—সেই তরীটিই
এল না মোর বন্দরে।
এবার আমার বর্ষা গেল
এম্‌নি নিরানন্দ রে !

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

—বিধির বিধান—

কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করে অবধি নিশ্চিন্ত মনে বসে "আরাম" জিনিষটা একেবারে ভুলে গেছলুম। সকালে উঠেই Collageএ attend করা, আর সারাদিন ধরে রক্ত, পুঁজ, ঘাঁটাই আমার এক রকম অভ্যাসগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাত্তির বলে যে একটা সময়, লোকে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম কর্ত্তে পায়, আমার ভাগ্যে তাও সব সময় ঘটে উঠ্‌ত না। এই ভাবে আমার জীবনের দিনগুলো বৈচিত্র্যহীন হয়ে কেটে যাচ্ছিল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

কিন্তু আমার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যেও হঠাৎ একদিন বৈচিত্র্যের আভাস মিল্‌ল। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে' শরীরটা বড় অসুস্থ বোধ হতে লাগ্‌ল। তাড়াতাড়ি করে querterএ ফিরে এলুম। মাকে অসুস্থতার কথাটা জানিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিতে হ'ল। তারপর থেকে কিভাবে আমার দিন কেটেছে…কিছুই টের পাই নি। হঠাৎ একদিন চেয়ে দেখি Principle সাহেব বিছনায় পাশে বসে রয়েছেন আর আমি শুয়ে আছি। অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বস্‌তে গেলুম… মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। ভাব গতিক দেখে, তিনিও বেশ গম্ভীর মেজাজে আমার কলেজে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস্ কর্‌তে আরম্ভ করে দিলেন। আরও অপ্রস্তুত হয়ে দোষ স্বীকার কর্‌লুম। আর এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই Principie সাহেবের অট্টহাস্যে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

আমাকে হতভম্বের মত দেখে Principle সাহেব একে একে কলেজের প্রত্যাগমনের পরদিন থেকে এই ২১শ দিনের একটা লম্বা ফিরিস্তি দিলেন। তারপর আমার হাতদুটোকে নিয়ে মার হাতে দিয়ে, আধা বাঙলায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর থেকে দিনের পর দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে লাগ্‌লুম। কিন্তু তখনো মনটার মধ্যে কেবলই patient দের চিন্তা উঁকি মারতে লাগ্‌ল···তারা যেন আমার প্রত্যাগমনের পথ চেয়েই বসে রয়েছে। এই ভাবে যত দিন যেতে লাগ্‌ল আমিও ততই নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হতে লাগলুম। সেদিন সকাল বেলা মাথাটা বেশ পরিষ্কার মনে হল। বিছনাতে বালিস্‌টা হেলান দিয়ে Anatomyর বইখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় Collageএর চাপ্‌রাসীটা Peon বইখানা হাতে করে সামনে এসে দাঁড়াল। বিছনার পাশেই টেবিলটার ওপর খাতাখানা খুলে পেন্‌সিলটা হাতে দিলে, একটা সই করে খামটা ছিড়ে ফেল্‌লুম। চিঠিটায় দেখি যে আমার Collge থেকে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। বিনা দরখাস্তয় ছুটি মঞ্জুর দেখে বেশ আনন্দ বোধ হল। কিন্তু আবার Principle সাহেবের চিঠিটায় দেখি, যে তিনি আমায় শীঘ্র কোথাও Changeএ যেতে আদেশ করেছেন। এ আবার কি বিপদ হল······ Changeএ যাওয়ার মধ্যে দেশে ঘুরে আসাই আমার change ছিল। তবে patientদের উপদেশের কসুর কখনও করিনি। এবার নিজের ওপর সেই char geএ যাওয়ার আদেশ শুনে, তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে principle সাহেবের হুকুমটা জানালুম। মা কিন্তু এ কথা শুনে বল্‌লেন—

"কেন আমি ত সব ঠিক করে ফেলেছি যতীন। আমরা আস্‌ছে সপ্তাহেই ত বেরিয়ে পড়ব।"

"সেকি মা! কোথায় যাবার ঠিক করেছ? দেশে গিয়ে ত এবার আর change হবে না?"

"হ্যাঁরে যতীন, সত্যি সত্যিই কি আমি আর কিছু জানি না। আমি তোর মাসিকে বলে, পুরীর বাড়ীটা যে ঠিক্ করে ফেলেছি।"

"হ্যাঁ, মা, এসব কথা কি আমাকে একটু জানাতে নেই।"

"রুগীর সঙ্গে পরামর্শ করে সব কাজ কর্‌তে গেলে ত আর চলে না যতীন।"

বিনা দরখাস্তয় ছুটির কারণটা এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে এল।

* * * *

কদিন হল পুরীতে এসেছি। কি সুন্দর এ স্থানটা। কবির কাব্যেই শুধু এতকাল পুরীর বর্ণনা শুনে এসেছি, চাক্ষুস দেখবার সৌভাগ্য কখনো ঘটে নি, আর ঘটবার আশাও ছিল না। সমুদ্রের পাশেই আমাদের বাড়ীখানা। সকালে উঠেই সেই বালুবেলার উপর দিয়ে যেতুম বেড়াতে—যতদূর পারতুম এগিয়ে যেতুম। স্বভাবের সৌন্দর্য্য গুলোকে বেশ নতুন ভাবেই রোজ দেখতুম। প্রায়ই পথের মাঝে সমুদ্রের কোল থেকে নবারুণের জন্মগ্রহণ দেখতুম। এ সৌন্দর্য্যটুকু যেদিন উপভোগ করবার সুযোগ ঘটে উঠত না, সে দিনটায় কোন রকমেই আর মনটায় শান্তি আস্‌তনা। বিকেলে রোজ একটা বালির স্তূপের ওপর বসতুম, আর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গগুলোর দিকে চেয়ে বিভোর হয়ে যেতুম। কত সময় মনে হত যদি Anatomyর চর্চ্চা অপেক্ষা, একটু কবিতা কিংবা সাহিত্যের আলোচনা করতুম, না জানি এখানে কি আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া যেত। অথবা আমার অপেক্ষা যদি এখানে একটা কবি, বা সাহিত্যিক আস্‌ত, না জানি সে এই বালির স্তূপের ওপর বসে কি ভাবাই না লিখে যেত, আর যা

থেকে, হয়ত আমার মতও একটা লোক, অনেকটা শান্তি উপভোগ করত। একদিন লেখাপড়ার ভেতরেও সেলি, বায়রণ থেকে সুরু করে আমাদের দেশস্থ মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি কারও বই পড়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হইনি। বই পড়াটা আমার একটা মস্ত অভ্যাস ছিল, তবে নিজের মধ্যে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়ার চেষ্টা কখন করিনি আর সে সবগুলো অপেক্ষা Anatomy টাই লাগত ভাল আর সেটাকে নিয়েই শরীরপাত করতে সুরু করে-ছিলুম। রোজ সেই বালীর স্তুপটায় বসে সূর্য্যাস্ত দেখতুম আর মনটার মধ্যে নানা রকম ভাব জেগে উঠ্‌ত। ছেলেবেলায় শিখেছিলুম বাঁশী তাও এই Anatomyর চাপে একেবারে ভুলিয়ে গেছে। আবার সেই সব কথা মনে পড়ত.. ...ছেলেবেলায় আমি বাজাতুম বাঁশী আর সে গাইত গান।

*   *   *   *

দু' মাস এই ভাবে বেশ কেটে গেল, মনটার সঙ্গে শরীরটাও বেশ সেরে উঠতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই টিপ টিপ করে বৃষ্টি সুরু হওয়ায় খুব সকাল সকাল বাড়ীতে ফিরতে হল। বাড়ী ফিরে এসে একখানি পুরানো নবযুগ টেনে নিয়ে অলসভাবে চোখ বোলাতে লাগলুম। হঠাৎ অমিয় মিত্রের লেখা "পথিক বন্ধু" বলে একটা গল্পের ওপর চোখ পড়ল। লেখক এই গল্পে সমুদ্রের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি পড়ে আমার নেহাৎ অকবি মনও কিছুক্ষণের জন্যে যেন কেমন উদাস হ'য়ে এল। মনে হ'ল, আমি যদি কবি হতুম পুরী আসা তবেই যেন আমার সার্থক হ'ত।

একবার, দুবার করে অনেকবার পড়েও যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। এত তন্ময় হয়ে গেছলুম যে বাইরে কে একটা লোক বার বার করে কড়া

নাড়ছিল আমি তা একেবারে শুনতেই পাইনি। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উটে দরজা খুলতেই দেখি, একটা হিন্দুস্থানী দরোয়ান গোছের লোক ডাক্তার বাবুর খোঁজে আমায় ডাকছে। আমায় দেখেই লোকটা কোন রকম গৌরচন্দ্রিকা না করেই বলে ফেল্‌লে—

"ডাক্তার বাবু শিগ্‌গির চলুন, বড় বিপদ।" প্রথমতঃ লোকটার ওপর বড় রাগ হল; আবার সেই Patient দেখা। রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলুম—

"কেন তুমি আমায় বিরক্ত কর্‌তে এসেছ বাপু, আমি কি এখানে ডাক্তারী করতে এসেছি যে তুমি আমায় এই বৃষ্টিতেও বিরক্ত কর্‌তে এসেছ? যাও বাপু, ডাক্তার বাবু এখানে অনেক আছে, আমাকে আর এই ঝড় বৃষ্টির রাতে জ্বালিও না।" লোকটা দেখি একেবারে নাছোড়বান্দা, শেষকালে আর কোন অস্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে না পেরে সে একেবারে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে—

"বাবু, সবার কাছ থেকে ফিরে, শেষে আপনার কাছে এসেছি। আপনিও যদি ফেরান, তাহলে আমাদের দিদিমণি আর কোন রকমে বাঁচবেন না। বড় বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি বাবু, আপনি আর ফেরাবেন না, শিগ্‌গির চলুন।"

তার কাতরতা দেখে মনটা একটু নরম হয়ে এল। শেষ পর্য্যন্ত আমি আর কোন আপত্তি করতে পারলুম না; হাজার হোক, আমি ত ডাক্তার। মার কাছে গিয়ে এই বিপদের কথাটা জানিয়ে বল্‌লুম, আমার এক্ষুনি যাওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রথমটায় তিনি খুব আপত্তি করলেন…পরে সব কথাগুলো শুনে আমার মতেই মত দিয়ে ফেল্লেন। তাড়াতাড়ি বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে চাকরটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

* * * *

কাছেই বাড়ী···পৌঁছুতে বেশী দেরী হল না। আমাকে বাইরের ঘরটায় বসিয়ে তাড়াতাড়ি সে ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে বল্লে "আপনি শিগ্‌গির ভেতরে আসুন।"

একটা আলো হাতে করে, আমাকে ভেতরের পথ দেখিয়ে রুগীর ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলুম, এক বৃদ্ধ একটী তরুণীর অচেতন দেহ কোলে করে বিছানার ওপর বসে রয়েছেন। আমাকে দেখেই বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন—

"বাবা যতীন, আমার লীলার কি হল বাবা! আমার শত চেষ্টা বুঝি পণ্ড হল!" রুগীর দিকে চেয়ে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম "জেঠা-মশায়, আপনারা—এখানে কবে এলেন?"

"সব কথা হবে বাবা—আগে আমার লীলাকে দেখ।" তাড়াতাড়ি কম্পিত হস্তে Pulseএ হাত দিয়ে সিউরে উঠলুম। বুঝলুম, লীলার লীলা ফুরিয়ে এসেছে—বড় জোর আর দু' এক দিন। প্রাণটার মধ্যে আগুন বয়ে গেল; ছেলেবেলাকার সেই সব কথাগুলো পর পর মনে আস্‌তে লাগ্‌ল। সেই গুরুমশায়ের পাঠশালায় আমাদের পরিচয়। একদিন এই লীলার বাবা তাকে সেখানে ভর্ত্তী করে দিয়ে গেলেন আর আসবার সময় বলে গেলেন তোর এই যতীনদাদার সঙ্গে রোজ আস্‌বি যাবি। তারপর যতদিন পাঠশালায় পড়েছিলুম সে রোজ আমার সঙ্গে যেত আর আস্‌ত। আমিও পাঠশালা ছাড়লুম, সেও সেই থেকে পাঠশালা ছাড়লে। আমি পড়তুম গ্রামের স্কুলে; সে পড়ত তার বাবার কাছে। সকালে বিকেলে রোজ আমাদের পুকুর পাড়ে দেখা হত...কত খেলা, কত গল্পই তখন আমাদের মধ্যে হত। স্কুল থেকে এসেই যেতুম তাদের বাড়ীতে...তখন লীলার মা ছিলেন, তিনি আমাকে

লীলার সঙ্গে রোজ খেতে দিতেন, আমিও অবাধে সে খাবারটুকু রোজ খেতুম। তারপরেই দুজনে বেরিয়ে পড়তুম খেল্‌তে। শৈশবের দিনগুলো কি সুন্দর! সোমেদের বাগানটা ছিল আমাদের খেলার আড্ডা। আর সেই পুকুরের পাড়টায় বসে লীলা গাইত গান, আমি একমনে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাক্‌তুম। আমার গলাটা ছিল একেবারে যাকে বলে রাসভ-নিন্দিত। কতদিন লীলা আমায় গান শেখাবার চেষ্টা করেছিল, শেষে সে একেবারে হতাশ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর খেয়াল হল এবার থেকে লীলার গানের সঙ্গে বাঁশী বাজাতে হবে। সেই থেকে তার গানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজাতে শুরু করলুম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার গানের সঙ্গে বাঁশীর অনেক তফাৎ হয়ে যেত আর সেও গান থামিয়ে ফেল্‌ত। তারপর লীলার মার অসুখের সময় আমরা তার কাছে বসে থাক্‌তুম। কত রকম গল্প তিনি আমাদের বল্‌তেন, কোন কোন দিন আমাদের বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আদর করে বল্‌তেন—

"জানিস্ যতীন; আমি যদি কোনদিন ভাল হই ত তোদের আগে আপনার করে নেব বাবা।"

তারপরেই কিছুদিন বাদে লীলার মা মারা গেলেন। লীলাকে ভোলাতে গিয়ে আমিও কেঁদে ফেলেছিলুম। সেই থেকে লীলাকে আমার মার কাছে এনে রাখতুম, সেও এই ভাবে মার শোক ভুলতে চেষ্টা করত। এই ভাবে স্কুলের পাঠ শেষ করলুম। আবার সেদিনটার কথা মনে পড়্‌তে লাগল...সেদিনটা ছিল রাখী পূর্ণিমার রাত। সোমেদের বাড়ীতে আমাদের সত্যনারায়ণ পূজার নেমতন্ন—দুজনে সেখানে পূজা দেখতে গেলুম, সকলেই যে যার মনস্কামনা প্রার্থনা কর্‌তে লাগল। লীলা আর আমি মার ইচ্ছাটা যাতে পূর্ণ হয় সেই প্রার্থনাই সেখানে করেছিলুম। তারপর থেকে বিধির নির্ব্বন্ধে সে

আর আমি পৃথক্ হয়ে গেলুম। আমার কলেজে ভর্ত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা মারা গেলেন। আমিও মাকে নিয়ে কল্‌কাতাতেই কলেজের পড়া চালাতে লাগলুম। মাঝে মাঝে দেশে আস্‌তুম, আর লীলার সঙ্গে দেখা হত। সেবার এসে দেখলুম লীলা কঠিন ব্যায়রামে ভুগছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কল্‌কাতায় ফিরে এলুম। তারপর থেকে দেশে গিয়ে তার দেখা পেতুম না। তার বাবা তাকে সারাবার জন্যে, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে দেশে যেতুম আর আমাদের ছেলেবেলার খেলার স্থান সেই পুকুরের পাড়টা দেখে আস্‌তুম। সেটাও যেন আমাদের বিরহে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছিল। আজ আবার ফের সেই লীলার দেখা পেলুম .....সে লীলায় আর এ লীলায় কত প্রভেদ। সে লীলা ছিল—সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুমটির মত......আর এ লীলা যেন বৃন্তচ্যুত শুষ্ক কুসুম।

সারারাত অক্লান্ত চেষ্টার পর সকালবেলা একটু চেতনা ফিরে এল। জেঠামহাশয় হাতদুটো ধরে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলেন। তাড়াতাড়ি হাতদুটো জড়িয়ে বল্‌লুম—

"আমায় আর কিছুদিন আগে একটু জানালেন না কেন জেঠামশায়? আমি আমার সাধটা একটু সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করে নিতুম।"

"যতীন, আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নি বাবা—এ রোগটাই দুরারোগ্য। তবে তোমার খোঁজ আমি করেছিলুম, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় তুমিও তখন রোগে ভুগছ শুনলুম। এখানে এসেও ইচ্ছা করে তোমায় ডাকি নি, কেননা তোমার শরীরটা দুর্ব্বল, তার ওপর এ সব রোগের চিকিৎসা করা ভাল নয়।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লুম—"জেঠামশায়, এখন চল্লুম আবার বিকেলে আসব।"

*　　　　*　　　　*

বিকেলে গিয়ে দেখ্‌লুম লীলার তখন বেশ জ্ঞান হয়েছে। তার বিছানার পাশে গিয়ে বসে পড়লুম। সে প্রথমটা মুখের দিকে চেয়ে রইল, কথা বল্‌তে গিয়েই কাসীর বেগটা সামলাতে পারলে না। কাসতে কাসতে খানিকটা রক্ত মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটু সামলে নিয়ে বল্লে—

"যতীন দাদা তুমি......তোমার সঙ্গে আমার যে আর দেখা হবে ভাবি নি।

আবার সেই কাসী। আবার খানিকটা রক্ত মুখ দিয়ে বেরুল। জেঠামশায় পাশের ঘরের দরজাটা খুলে চলে গেলেন। তাকে আমি বারণ করলুম।

"লীলা; তুমি আর এখন কথা বলো না; একটু ঘুমবার চেষ্টা কর।"

সে একটু ক্ষীণ হেসে বল্লে—

"আর ত কখন কথা বল্‌তে পাব না যতীনদা, এ ঘুমও ত আর আমার কখন ভাঙ্গবে না। আজ যে আমার শেষ দিন। মনে পড়ে সেই পূর্ণিমার রাতটার কথা...যতীনদা কি আশাই আমরা করেছিলুম। বড় দুঃখ্যু রইল যতীনদা সেটা আর এ জন্মে পূর্ণ হল না।" এই কথাকটি সে অতি কষ্টে বল্লে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে কাগজ মোড়া সিঁদুরের কৌটা বের করে লীলার মাথায় সবটা ঢেলে দিলুম। চারদিক থেকে সন্ধ্যার শাঁকগুলো এক সঙ্গে বেজে উঠল। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে, কোলের ওপর এলিয়ে পড়ল সে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে রক্তের রেখার সঙ্গে একটু হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

শ্রীনলীন্দ্র দেব।

—সম্বন্ধ ভঙ্গ—

"পিসী, ও পিসী, ওঠনা ছাই, যাইযে !"

ভুতনাথের পিসীমা তন্দ্রার ঘোরে বলিলেন, "তা যানা বাছা।"

"বাঃ! বেশ লোকত? কেউ মরে, আর কেউ হরি হরি বলে! ওঠনা বলছি", কথাটা বলিয়া ভুতনাথ পিসীমাকে জোরে একটা ঠেলা দিল।

পিসীমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "এঁ্যা, কি বলছিস ভুতো? ডাকলি আমায়?"

"না ডাক্‌বো কেন, তামাসা করছি! আমি যে আফিং খেইছি।"

"এ্যাঁ, বলিস কি? আফিং খেইছিস? ওমা, কি সর্ব্বনাশ হোলো গো! ওগো, তোমরা এসে দেখো গো, আমার ভুতো বুঝি যায় গো!"

পিসীমার কাঁসরের মত চাঁচাছোলা আওয়াজে ভাড়াটে বেহারীবাবু ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার গৃহিণীও গায়ের কাপড় চোপড় সামলাইতে সামলাইতে যত সত্বর সম্ভব ঢাকাই জালার মত দেহখানিকে দোলায়মান করিতে করিতে ভুতোর পিসীদের ঘরে আসিয়া হাজির হইলেন।

বেহারী বাবু প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "এ্যা, হয়েছে কি মাসী, এই রাত্তিরে?"

"ওগো, তোমরা দেখগো বাবু, ভুতো আমার কি সর্ব্বনাশ করলে গো! ওগো তোমরা পাঁচজনে বলগো, আমি কি দোষ করলুম যে, ভুতো আমায় ফাঁকি দিয়ে চললো গো, ওগো—"

"আরে, হয়েছে কি—"

"ওগো আর যে কেউ নেই গো আমার! ঐ যে শিবরাত্রিরের সল্‌তে টুকুগো! ওগো আমার হাতেই বাপ যে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলে গো!"

"আরে, কি মুস্কিল! মিছিমিছি চেঁচাচ্ছে দেখ। বলি হোলো কি?"

"ওগো আমি কিছু বলিনি গো! দুটো টাকা গো, ইয়ার বক্সীদের কালীঘাট দেবে গো! কেন মরতে দিইনি গো—"

বেহারী বাবু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "না,মাসী ত কিছু বলবে না। ওরে ভূতো কি হয়েছে বল দিকি।"

ভূতনাথ ওরফে ভূতো ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি আফিং খেইছি।" তাহার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও ভয়ের রেশ ছিল। বেহারী বাবু তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এই কথা! আমি বলি আর কিছু।"

পিসীমা নয়নযুগল যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করিয়া বলিলেন, "এ্যাঁ, বল কি, আরও কিছু? ছেলে আফিং খেলে সেটা কিছু নয়?"

"তুমিও যেমন মাসী, ও সেই ছেলে কিনা, তোমায় ভয় দেখাচ্ছে টাকা আদায়ের জন্যে। চল, চল, শুইগে যাই। ভাল আপদ! রেতেও ঘুমোবার যো নেই।"

কথাটা বলিয়া বেহারীবাবু নিজের ঘরের দিকে চলিলেন। পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওমা চললে যে বোনপো? ছেলেটার একটা হিল্লে করে যাও।"

ভূতো বলিল, "বেশ, তোমরা ঝগড়া করতে থাক, আমি আফিং খেইছি কিনা, এদিকে আমি মারা যাই। বেশ!"

বেহারী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তুমি খেপেছ মাসী—ও ছোঁড়া আফিং খাবে? আফিং খেলে এতক্ষণ হাত পা খিচ্‌তো, মুখ দিয়ে গাঁজা উঠ্‌তো, পেট কাঁপতো। এই ভূতো, সত্যি কি করিছিস্ বল্।"

ভুতো বলিল, "আফিং খেঁইছি।"

"কতটা ?"

"এই এতটা।"

বেহারী বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ভুতো আফিংয়ের যে পরিমাণ দেখাইয়াছিল, তাহা একটা সর্ষপের আকারেরও হইবে কিনা সন্দেহ। তাই তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ মাসী, ছেলেটার মাথা তুমিই খাচ্ছ। যার প্রাণের ভয় এত যে, সর্বে ভোর আফিং গালে দিয়ে পিসীকে ডাকে বাঁচাতে সে সত্যি আফিং খাবে ? তোমায় বলে দিচ্ছি, একটা পয়সাও ওর হাতে দিও না। গোল্লায় গেল একেবারে, গোল্লায় গেল!"

বেহারী বাবু সস্ত্রীক নিজের শয়ন কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। পিসীমা তখন রাগে ফুলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ও হতচ্ছাড়া মুখপোড়া! আমার সঙ্গে মস্কারা ? বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

পিসীমা দাঁড়াইয়া উঠিতেই ভুতো এক লম্ফে শয্যাত্যাগ করিয়া দ্বার-দেশে উপনীত হইল এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, "বয়ে গেল, তোর ভাত আর নাই খাব। ওঃ ভারী ত পিসী! চল্লুম এক্ষুনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে।"

(২)

যাই কোথা ? খাই কি ? পিসীর নোনাধরা পাঁজর-বার-করা বাড়ীখানার ইঁটচুণ, না জানালা গরাদে ? বুড়ীর আর সব ভাল, কেবল পয়সা কড়ি বাহির করিবার সময় বেটী যেন 'যক্ষি' !

দিবা দ্বিতীয় প্রহরের কাটফাটা রৌদ্রে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভূতনাথ আপনার সুখ দুঃখের কথা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। সেই যে সে শেষ রাত্রিতে পিসীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া পলাইয়া আসিয়াছে, তাহার পর-প্রভাতে ডেপো হরির অপেরার আড্ডায় এক ছিলিম গাঁজার

ধূম ব্যতীত তাহার পেটে আর কিছু প্রবেশ লাভ করে নাই। আড্ডায় ডুগী তবলা আছে; বেহালা হারমোনিয়াম আছে, তীর ধনু কীরিচ গদা আছে; পাকা চুল, কাঁচা দাড়ী, হনুমানের লেজ, ভীমের গদা আছে, আছে অনেক কিছু, নাই কেবল পেটে দিবার সামান্য কিছু। ক্ষুধার তাড়নায় সে ক্ষণেক তবলা পিটিল, ক্ষণেক ঢোলে ঘা দিল, তাহার পর আখড়ায় ক্ষণেককাল ডাম্বেল ভাঁজিল, ডন ফেলিল, কুস্তী লড়িল, ট্র্যাপিজে ঝুলিল, কিন্তু দুঃখের কথা ডেঁপো হরি, কেষ্টা ছুতোর বা হারু গোয়ালা—কেহই তাহাকে একদানা খাওয়ার কথা বলিল না। পিসীর পেঁটরা হাতড়াইয়া অথবা বাক্স ভাঙ্গিয়া সে যখন তাহাদিগকে বাগানটা কালীঘাটটা অথবা দক্ষিণেশ্বরটার পয়সা যোগাইয়াছিল, তখন তাহার সু-কথায় তাহারা পঞ্চমুখ হইয়াছিল, পিঠ চাপড়াইয়া বাহবা দিয়াছিল। আর এখন সে কালীঘাটটা দিতে পারিল না বলিয়াই না তাহার এই অবস্থা? সে যখন পিতাকে ফাঁকি দিয়া স্কুল পালাইত, তখন একদিন কুস্তীর মাটী মাখিয়া গৃহ-প্রবেশ কালে ধরা পড়িয়া পিতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, আজ তাহা মনে পড়িল,—"বেটা আমার 'জীবন নষ্ট' করছে! খাবি ত পিসীর কড়ায়ের ডাল আর পুঁইশাক চচ্চড়ি! কায়েতের ঘরের দামড়া—দেখিস বড় হ'লে খাওয়ায় তোকে ক'জন কেষ্টা ছুতোর আর ফকুরে জেলে।" আজ সে সত্যই কায়েতের ঘরের দামড়া হইয়াছে কি না বুঝিতে পারে না, তবে আখড়ার কেহ যে তাহাকে খাইতে দেয় না, তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

আজ সে বাপ কোথায়? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু! আছে পুঁজির মধ্যে এক পিসী, পিসীর 'পোড়ো' বাড়ী সেই বাড়ীর দু'খানা ঘরের ভাড়া নগদ ২০৲ টাকা, আর—আর আছে ছাতুর দেশে চাকুরীর আণ্ডামানে সপরিবারে নির্ব্বাসিত একমাথা টাকওয়ালা তাহার ভগিনীপতি হাজারী

সরকারের অযাচিত মুরুব্বিয়ানা। পিতা সরকারী ছাপাখানায় কম্পোজিটারী করিয়া মাসে নগদ ২২ টাকা ১০ আনা ৭ পাই উপার্জ্জন করিতেন আর মাতৃহীন পুত্রকে লইয়া ভগিনীর গৃহে 'মানুষ' করাইয়া লইতেন। তাঁহার ইহলোকের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে মাসিক ২২টি টাকাও ছুটি লইয়াছিল ভরসা তখন পিসীর ঐ বাড়ী ভাড়ার ২০টি রজতমুদ্রা। শৈশবে সে মাতৃহারা। তাহার গর্ভধারিণী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছিলেন,—অধিক কাল জীবিত থাকিলে এমন পুত্ররত্নকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রত্নগর্ভা নামে আপনাকে পরিচিত করিবার অবসর দান না করিয়াই তাহার এক বৎসর বয়সেই ইহলোক হইতে ছুটি লইয়াছিলেন। তবে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধিও যে ছিলনা এমন কথাও বলা যায় না, কেননা তিনি যদি সুতিকাগারে স্তন্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার রত্নের মুখে কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া যাইতেন তাহা হইলে দুঃখিনী বসুন্ধরার গুরুভার বহুল পরিমানে হ্রাস হইত, সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথকে আজ দগ্ধ জঠরের জ্বালায় দ্বিপ্রহরে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া ভাবিতে হইত না। ভূতনাথ আজ সঙ্কল্প করিয়াছে ঘরে ফিরিবে না, গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবে তবু পিসীর ভাত খাইবে না। কিন্তু গঙ্গার কাছে আসিয়া— বাপরে! যে ঢেউ, জলে নামিতে পা কাঁপে যে, বুক গুরু গুরু করেই ত!

হঠাৎ ভূতনাথের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। ঘাটের সোপানের উপর এক পার্শ্বে একখানা নামবলি আর একটা তামার ঘটি না? ব্রাহ্মণ নাভি-জলে দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপাহ্নিক করিতেছিলেন। পাণ্ডারা অনেকে আহারের যোগাড়ে বাসায় চলিয়া গিয়াছে, যে দুই এক জন আছে তাহারা চাঁদনীর মধ্যেই কাপড় বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। এই ত সুযোগ।

ভূতনাথ সোপান বাহিয়া গঙ্গাজলে অবতরণ করিল। চোখে মুখে জল দিয়া উঠিয়া আসিবার সময় ভ্রমক্রমে না বলিয়া নামাবলি ও ঘটিটা

উঠাইয়া কাপড়ের খুঁটে ঢাকা দিয়া কোন দিকে না চাহিয়া ভাল মানুষ ভদ্রলোকটির মত ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে উঠিল। সেখানে হইতে সরাসরি উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া একটা গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

(৩)

ঘটিটা ভূতনাথ চারিআনায় বিক্রয় করিল। এমন অনেকবারই করিয়াছে। কেন না পিসীমার ও ভাড়াটিয়াদের কাপড়খানা ঘটিটা বাটিটা অনেকবার এইরূপ না বলিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে এবং ভূতনাথের কল্যানে বিক্রমপুরে তাহাদের সদ্গতিও হইয়াছে। সুতরাং অভ্যস্ত পথে চলিতে ভূতনাথের চরণে সামান্য কঙ্করটিও বিঁধিল না।

তখনও বেলা রহিয়াছে। ভূতনাথ বিক্রয়লব্ধ নগদ ষোলটি পয়সা হইতে খাবারের দোকানে বসিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল, পরন্তু পানবিড়ি কিনিয়া উহারাও সদ্ব্যবহার করিল।

পথে বাহির হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, এখন যায় কোথা। ভাবিতে ভাবিতে মোহিতের কথা মনে পড়িয়া গেল। মোহিতের সঙ্গে বিদ্যা-সাগরের স্কুলে সে পড়িয়াছিল। চোরবাগানে মোহিতদের মস্ত বাড়ী—সে বড়লোকের ছেলে, জুড়ীগাড়ী চড়িয়া স্কুলে আসিত। মোহিতকে সে পাঞ্জা কসিতে, ঘুঁষি লড়িতে এবং টেবিল চাপড়াইয়া গান গাহিতে শিখাইয়াছিল, অনেক থিয়েটারের টপ্পাও সে মোহিতের খাতায় টুকিয়া দিয়াছিল। স্কুল ছাড়িয়া অবধি মোহিতের সহিত এখনও তাহার মাঝে মাঝে দেখা হয়। নিতান্ত পয়সার টানাটানি হইলে সে মোহিতের নিকট দুই একটাকা কর্জ্জ লইয়া আসিত। মোহিত দুই চারিবার কর্জ্জ দিবার পর যখন বুঝিয়াছিল—কর্জ্জের টাকার ফেরত আসিবার সম্ভাবনা কিরূপ, তখন বিরক্ত হইয়া সে হাত গুটাইয়া ছিল।

আজ ভূতনাথ শেষ একবার কল্পবৃক্ষ নাড়া দিয়া ফল কুড়াইবার আশায়

চোর বাগানে পাড়ি জমাইল। ব্রাহ্মণের নামাবলি খানি স্কন্ধে ফেলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিল। তাহার পায়ে জুতা বা গায়ে জামা নাই, এক কাপড়েই সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল। পুরাতন দ্বারবান তাহাকে চিনিত, সে বাড়ী গিয়াছিল। বদলী নূতন দ্বারবান তাহার গায়ে নামাবলি ও পায়ে জুতা নাই দেখিয়া বাড়ীর গুরু পুরোহিতের সন্তান মনে করিয়া প্রণামান্তে ভিতরে ছাড়িয়া দিল। ভূতনাথ সরকারদের ঘরে না ঢুকিয়া সরাসরি কাঠের সোপান বাহিয়া দ্বিতলে মোহিতচন্দ্রের বৈঠকখানায় হাজির হইল। মোহিতই এখন মালিক, আজ তিন বৎসর হইল সে পিতৃহীন।

ভূতনাথ কক্ষে প্রবেশ করিতে প্রথমটা সঙ্কোচ বোধ করিল। আধুনিক ফ্যাসানে নানা মূল্যবান আসবাব পত্রে কক্ষখানি সজ্জিত—ভূতনাথ একহাঁটু ধুলা সমেত সুন্দর কার্পেটের উপর পাদবিক্ষেপ করে কিরূপে? কিন্তু ভূতনাথের সঙ্কোচ বা দ্বিধা ক্ষণস্থায়ী মাত্র,—উহা তাহার স্বভাব। সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি কোমল সোফায় অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া পড়িল। দেওয়ালে চমৎকার ইংলিশ ক্লক্ টিক্‌টিক্ করিতেছিল—ভূতনাথ চাহিয়া দেখিল, প্রায় ৬টা। উঃ এত বেলা হইয়াছে? তাহার কাজ অনেক, হালফীল সন্ধ্যার পরই ভেঁপো হরির আড্ডায় দিয়া চরসের ছিলিম চড়াইতে হইবে। চরস, গাঁজা বা তামাক সাজা তাহার একচেটিয়া ছিল। হারু গোয়ালা বলিত, ভূতোর হাতের সাজা কল্কে যেমন মিষ্টি লাগে এমন কাহারও না, আর জন্মে নিশ্চয়ই সে কোন নবাবের হুঁকাবরদার ছিল। অয়েলপেন্ট করা দেয়ালে বড় বড় আয়না ঝুলিতেছে, মেঝে কার্পেট-মোড়া, সোফা, ইজি চেয়ার, কৌচ, গদীমোড়া কেদারা, ফরাস বিছানা, মার্ব্বেল ও চীনামাটির পুতুল, বড় বড় অয়েল-পেন্টিং, বৈদ্যুতিক ফ্যান লাইট—বড়লোকের বৈঠকখানায় কোন

আসবাবের ত্রুটি ছিল না।

ভূতনাথ সম্মুখের দেয়ালজোড়া আয়নায় একবার নিজের মূর্ত্তিখানা দেখিয়া লইল,—বাঃ বেশ মানাইয়াছে, মাথায় একটা টিকি থাকিলেই একবারে পুরা ভাটপাড়ার ভটচায্! ওঃ বামুনের নামাবলিখানা কি কাজেই লাগিয়া গিয়াছে!

হঠাৎ ভূতনাথ চমকিয়া উঠিয়া প্রায় সোফা হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল,—তাহার পশ্চাতে বীণার মত মধুর ঝঙ্কারে কে বলিল, "বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুর! মাতাইব ধরা সুরা আনি—"

মুহূর্ত্তে চারি চক্ষুর মিলন। ভূতনাথ দেখিল—যাহা জীবনে কখনও দেখে নাই, অপরূপ রূপময়ী অনবদ্যাঙ্গী কিশোরী। ভূতনাথের সংস্কৃত বিদ্যা জানা থাকিলে বলিত,—তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি! কবির বর্ণনা, এ যে তাহার সাকার বিগ্রহ! এতরূপ নারীর হয়? সুন্দরীর আয়ত নীলোৎপল নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত, কমলদলতুল্য চরণ কক্ষমধ্যে প্রসারিত, অন্য চরণ কক্ষের বাহিরে ন্যস্ত—কিশোরী ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় অবস্থান করিয়া তাহারই দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। সে কক্ষমধ্যে যেন চঞ্চলা চপলার মত রূপের ঝলক ছড়াইয়া দিয়া নিমিষে চপলা-চমকেরই মত ভূতনাথের চক্ষু ঝলসিত করিয়া অন্তর্ধান করিল—ভূতনাথ বিস্ময়ে বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্ষণপরে ভৃত্য আসিয়া বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল, সে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিল। "কে ঠাকুরমশাই, পেন্নাম" বলিয়া সে চলিয়া গেল। সে কেন, কাহার জন্য, বসিয়া আছে, এযাবৎ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। সেও একটা মতলব আঁটিয়া কাহাকেও

কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ব্র্যাকেটের পার্শ্বস্থ আলনায় একখানা চকচকে রেশমী চাদর ঝুলিতেছিল, সে খানি ভূতনাথের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে নাই। ভূতনাথ উঠিয়া একবার কক্ষের বাহিরে চারিদিক দেখিয়া লইল, বারাণ্ডায় কেহ কোথাও নাই। উপযুক্ত অবসর! তাহার বন্ধু যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহার এই অবসর ঘটাইয়া দিয়া থাকে, তবে সে তাহা পরিত্যাগ করিবে কেন?

ভূতনাথ আর একবার বাহিরের বারাণ্ডাটা দেখিয়া লইল, তাহার পর চাদরখানি তাহার শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ হস্তে ঝটিতি তুলিয়া লইয়াই কুক্ষিগত করিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পদার্থও চাদরের সঙ্গে বিচ্ছেদের ভয়ে আপনা হইতেই আসিয়া তাহার কুক্ষির জালে আটক পড়িল। নামাবলি খানি ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া ভূতনাথ ক্ষিপ্রগতি সোপান বাহিয়া নামিয়া গেল। দেউড়ীতে মিশিরজী পিলু ভাঁজিতে ছিলেন, তিনি তাহার দিকে দৃকপাতও করিলেন না, এমন কত বামুন পুরুত আনাগোনা করিতেছে।

গলীতে নামিয়া ভূতনাথ একা ৬৩ হস্ত পরিমিত স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তখন সে মনে মনে ভাবিতেছিল, দোষ কিছু করেছি কি? না, দোষের মধ্যে দোষ যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে সে না বলিয়া লইয়া আসা। কিন্তু ইহাতে ক্ষতি ত কাহারও হয় নাই, বরং একজনের লাভ হইয়াছে। মোহিতের এমন কত চাদর আছে—একখানা গেল না গেল, তাহাতে তাহার কি বহিয়া গেল? এই যে কতবার সে বলিয়া তাহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, অথচ বলিলেও শোধ দেয় নাই, তাহাতেই বা মোহিতের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইয়াছে? বলিয়া লইলেও যাহা, না বলিয়া লইলেও তাই, তবে দোষ কি?

মনের মধ্যে এইরূপ নৈতিক তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে ভূতনাথ

যে মুহূর্তে গলীর বাঁক ফিরিয়াছে, অমনই সর্ব্বনাশ! বিধাতার কি অবিচার—এমনই কি অঘটন ঘটাইতে হয়? তাহারই দিকে গলীর অপর দিকে হন্ হন্ করিয়া নারায়ণ শীলার মত কি একটা পদার্থ লইয়া অগ্রসর হইতেছে ও কে? সেই গঙ্গার ঘাটের বামুনটা না?

বিশেষজ্ঞ ভূতনাথের তখনকার অবস্থা বুঝিয়া লইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। ব্রাহ্মণ মোহিতের বাড়ীতে সন্ধ্যার পূজা করিতে আসিতেছে। জলজীয়ন্ত নামাবলি খানা! ঝটিতি সে নাবাবলি খানা কুক্ষিগত করিয়া রেশমী চাদর মায় অজ্ঞাত পদার্থটা কুক্ষিচ্যুত করিল এবং চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে রেশমী চাদরখানা গায়ে জড়াইয়া সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণের সমীপবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণ যেমন নির্ভীক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, সেও সেইরূপ দৃষ্টিতে তাঁহার দৃষ্টির প্রত্যুত্তর দিল। তাহার পর যে যাহার পথে চলিয়া গেল। এতক্ষণ ভূতনাথের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল, ব্রাহ্মণ বুঝি ধরিয়া ফেলে, কিন্তু যখন সে ব্রাহ্মণ কোন কিছু না বলিয়া আপন মনে চলিয়া গেল, তখন ভূতনাথের আনন্দের প্রতিঘাতটা এত জোরে আসিয়া বুকে ধাকা দিল যে, সে আর একপদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া একটা রোয়াকে বসিয়া পড়িল।

(৪)

সিল্কের চাদরখানা খুলিবার সময়ে যে পদার্থটা ভূতনাথের হাতে ঠেকিয়াছিল, ভূতনাথ গলির মোড়ে গ্যাসের আলোকে দেখিল, সেখানা গরদের পাঞ্জাবী, বিপদ যেমন কখনও একা আইসে না, তেমনই বোধ হয় চোরাই মালও কখনও একা আইসে না, তাই ভূতনাথ আহ্লাদে আটখানা হইয়া দেখিল, পাঞ্জাবীর বুকে বোতাম আঁটা—সে বোতাম কয়টা গিনি সোনার ত বটেই, পরন্তু তাহাদের শীর্ষদেশে একটি করিয়া

দামী পাথর আঁটা। ভূতনাথের পা দুইটিতে কণ্ডূয়ন আরম্ভ হইল। কদম্বের যেমন বর্ষার জল পাইলে শিহরণ হয়, চোরাই মাল জমা করিলে তেমনই ভূতনাথের চরণ যুগলে নৃত্য শিহরণ জাগিয়া উঠিত। বাঁচিয়া থাকুক নামাবলি! তাহার কল্যাণে আজ তাহার ঘটি, রেশমী চাদর, রেশমী জামা, সোণার বোতাম। না, নামাবলি বাঁচিবে কেন, বাঁচিয়া থাকুক পিসী! পিসী যদি তাড়াইয়া না দিত, তবে ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাওয়া হইত না, গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে না গেলেও ত বামুনের লোটা নামাবলি না বলিয়া ধরা দিত না, আর নামাবলি না পাইলেও ত চাদর জামা সোনা জহরৎ বগলে চাপা দিবার সুবিধা হইত না। অতএব থ্রিচিয়ার্স ফর পিসীমা! হিপ হিপ্ হুররে! হায় হায় এমন পিসীকেও কাঁদাইয়া বেড়াইতেছে ভূতনাথ—তাহার সোল এয়ার এপেরেন্ট—ভাঙ্গা বাড়ীর ভবিষৎ মালিক! ধিক!

ভূতনাথ দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই সে প্রথমে নকুড় স্বর্ণকারের দোকানে দর্শন দিল।

নকুড়ের সহিত চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া দুই একবার মাথা নাড়া-নাড়ির পর ভূতনাথ নগদ ২৫টি রজত মুদ্রা ট্যাকে গুঁজিয়া জিনিষগুলি রাখিয়া চলিয়া গেল। নকুড়ের সহিত ভূতনাথের এই কারবার নূতন নহে। নকুড় জানিত, যাহা তাহার সিন্দুকে একবার বন্ধকরূপে স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার আর বহির্গমনের উপায় থাকিবে না।

ভূতনাথ মহা উল্লাসে পিসীর ভাঙ্গা ঘরের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পিসী! পিসী!" পিসী ভাড়াটে বাবুদের ঘরে বসিয়া কাঁথা সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্বশুর কুলের ধনদৌলতের গল্প করিতেছিলেন। ভূতনাথের ডাকে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, তাঁহার ভূতো আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। একবারে আলুথালু হইয়া

ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া তিনি প্রায় কান্নার সুরে ফুঁপাইয়া উঠিলেন, "কেরে, আমার ভূতো কি ফিরে এলি?"

তখন পিতৃস্বসা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের যে মিলন হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নহে। কিছুক্ষণ একপক্ষে কান্নার প্যাসিফিক ওসান ও অপর পক্ষে তাহার ভান বহিবার পর পিসী যখন শুনিলেন, তাঁহার ভূতোর চাকুরী হইয়াছে এবং ভূতো যখন আগাম ২৲ টাকা (পাওনার করকরে টাকা) দেখাইয়া তাঁহাকে হকচকাইয়া দিল, তখন তিনি তাহার মাথাটা কোলে টানিয়া লইয়া মাথায় চুমা খাইয়া অশ্রুসজল নয়নে বলিলেন, "বেঁচে থাক্, রাজা হ'ও, আমার মাথার চুলের মত তোর পেরমায়ু হোক্। বেটাবেটিরা বলে কিনা আমার ভূতো বওয়াটে, চোখখাগীরা বলে কি না আমার ভুতো গাঁজা টানে! আমার ভুতো কিনা তেমনই ছেলে। হাঁ বাবা, তোর যে একখানা নেখন এয়েছে, দু'দিন পড়ে রয়েছে, দেখ দিকি সন্নির ওখান থেকে এলো কিনা। আগে কিছু খা বাবা। আমি চট করে দু'মুটো চাল চাপিয়ে আসি তোর জন্যে।"

পিসী পত্র আনিয়া দিলেন। ভূতো মুড়ী ও নারিকেল নাড়ুর সদ্ব্যবহার করিতে করিতে পত্র পাঠ করিল। পত্র মিরাট হইতেই আসিয়াছে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী সরলাই লিখিয়াছে বটে। মিরাটের রমানাথ বাবু জুরুরী কাজে কলিকাতায় যাইতেছেন, বোধ হয় এই সপ্তাহেই কলিকাতায় পৌছিবেন। তাঁহার একটি ডাগর মেয়ে আছে। রমানাথবাবু কায়স্থ, ভূতনাথদেরই পালটিঘর; তাঁহার কিছু টাকা-কড়িও আছে, ভুতনাথের জামাই বাবুর আফিসে মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। তিনি কলিকাতায় গিয়া ভূতনাথকে দেখিয়া আসিবেন, পছন্দ হইলে তাঁহার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবেন। মেয়ে গেরস্থর ঘরের পাঁচপাঁচি মেয়ের মত, কিছু গয়না গাঁটিও পাবে বাপের কাছে, আর

ভূতনাথকেও তিনি দিবেন থুবেন মন্দ নয়। সে যেন লক্ষ্মী ছেলের মত তাঁহাকে দেখা দেয় এবং বেশ শিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা কয়। তাহা হইলে শ্বশুর তাহার একটা বড় চাকরীও করিয়া দিবেন। সম্ভবতঃ দুই এক সপ্তাহের মধ্যে একদিন সকালে তিনি তাহাদের বাড়ী গিয়া ভূতনাথকে দেখিয়া আসিবেন। লক্ষ্মীটি, ভাইটি, সে যেন সপ্তাহ দুই সকালে বাড়ী থাকে।

চিঠিতে কনের কথা পড়িয়াই ভূতনাথের, মোহিতের বাড়ীর সেই ডাগর্ ডাগর্ ভাসা চোখ দুটি আর গোলাপের মত ফুটফুটে মুখখানি মনে পড়িল। কোথায় সেই পরীরাজ্যের অপ্সরী, আর কোথায় রমানাথের পাঁচাপাঁচি! ভূতনাথ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু আকাশের চাঁদ হাতে ধরার আশায় বসিয়া থাকার অপেক্ষা মাটির পাঁচাপাঁচির সঙ্গে নগদ টাকা, গয়নাগাঁটি আর আফিষে চাকুরী নিশ্চয়ই ভাল। ভূতনাথ স্থির করিল, সে ভাল মানুষটির মত এই দুই সপ্তাহ সকালে বাড়ীতেই কনের বাপের জন্য অপেক্ষা করিবে।

(৫)

পরদিন সন্ধ্যার পর ভূতনাথ ঢেঁপো হরির আখড়া ঘরে বসিয়া চরসের কলিকায় টান দিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের ভাড়াটিয়া বাবুর পুত্র সুশীল আসিয়া বলিল, একজন বাবু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার মস্ত মোটর গাড়ীর উপর তিনি বসিয়া আছেন। ভূতনাথ চমকিত হইল, তাহার বাড়ী মোটর গাড়ী? কে এ ভদ্রলোক? মিরাটের কনের বাবা রমানাথ ভাড়াটে মোটরে আসিল নাকি? না, সে ত সকালে আসিবে বলিয়াছে।

ভূতনাথ হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর দিকে চলিল, কে গাড়ীতে বসিয়া আছে, দূর হইতে বুঝিতে পারিল না। একটু নিকটে গিয়া গাড়ীতে

যাহাকে দেখিল, তাহাকে চিনিয়া তাহার মুখ শুকাইল। কে এ? মোহিত না? সর্ব্বনাশ! সিল্কের চাদর—সোণার বোতাম! ভূতনাথকেই নাটের গুরু বলিয়া জানিতে পারিল না কি? ভূতনাথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া নিঃসাড়ে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মোহিত তাহাকে দেখিয়াছিল, সে গাড়ীতে বসিয়াই বলিল, "ভূতো না? আরে তোকেই খুঁজছিলুম ভাই। ওকি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে? চল, একটু বেড়িয়ে আসি। আয়, আর নামবো না, গাড়ীতেই কথা হবে'খন।"

মোহিতের বাড়ী সে টাকার টানাটানি না হইলে বড় একটা যাইত না বটে, কিন্তু মোহিত মাঝে মাঝে তাহার পাড়ায় আসিয়া তাহাকে এমন কতদিন গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া লইয়া আসিয়াছে। ভূতনাথ যখন দেখিল পলায়নের আর উপায় নাই, তখন অগত্যা মোটরে চাপিয়া বসিল। পাড়াপড়শীকে তাহার বড়লোক বন্ধুর মোটর চাপাটা দেখানর ইচ্ছাটুকুও ভূতনাথের একবারে ছিল না, তাহাও বলা যায় না।

গাড়ী গড়ের মাঠের দিকে ছুটিয়া চলিল। মোহিত বলিল, "দেখ, আমার একটা বড় জরুরী কাজ পড়ে গেছে, ক'রে দিবি তুই? তুইত বেকার বসে আছিস বলেছিস। তা তোরও কিছু হয়, আমারও একটা কাজ হয়। কি বলিস।"

ভূতনাথ বলিল, "কাজ, কি কাজ?"

"তুই ত টাকা টাকা করে গায়ের ছাল ছিঁড়ে খাস। টাকা ধার নিস, অথচ দিতে পারিস নে। তা, আমার কাজটা করনা, মাসে মাসে তার জন্যে তোকে ৩০৲ টাকা ক'রে দোবো। অন্য লোক রাখলেও ত আমায় মাইনে দিতে হোতো। পুরুত মশাই তাঁর ভাইপোকে আনবার

কথা বলছিলেন ; কিন্তু হঠাৎ তোর কথাটা মনে পড়ে গেল। ভাবলুম, একঢিলে দুই পাখী মারা হবে, আমার কাজও হবে, তোরও বেকার বসে থাকতে হবে না। আমার কাছে কতবার বলেছিস একটা চাকুরীর জন্যে।"

"কাজটা কি, আগে না শুনলে—"

"আরে কাজ কিছুই না বল্‌লেই হয়। আমার কখানা ভাড়াটে বাড়ী আছে। এবার ভাবছি, বাড়ী ক'খানা ঝেড়ে মেরামত কোরবো। বালীগঞ্জে ২ খানা, ধর্ম্মতলায় ৩ খানা, চৌরঙ্গীতে ২ খানা আর তালতলায় ৪ খানা, এছাড়া সীঁতির বাগান বাড়ীখানাও আছে, পাড়ার ৩ খানা বাড়ীও আছে। ২।৩ মাসের কম এক এক খানার মেরামত সারা হবে না। কাজেই ২।৩ বছর যাবে কেটে এতে। একজন লোক চাই মিস্ত্রীদের কাজ দেখতে—ফাঁকী না দেয় আর মালমশলা গুলো বুঝে নিতে। মাসে ৫০৲ টাকা করে পাবি—আমার গাড়ী তোকে নিয়ে যাবে, বাড়ী পৌঁছেও দেবে, সন্ধ্যার পর আমার বাড়ী একবার সরকার মশাইকে কটা রাজ কটা মজুর খেটেছে আর কি কি মাল মশলা এসেছে তার একটা হিসেব লিখিয়ে দিবি—আর ইচ্ছে করলে রাত্তিরে আমার ওখানে খাওয়া দাওয়া করে ঘরে ফিরবি। কি বলিস, কাজ করবি ?"

ভূতনাথ তখন কাজের কথা ভাবিতেছিল না—সে ভাবিতে ছিল একখানি মুখ পদ্ম, চকিতে চপলা-চমকের মত মোহিতেরই গৃহে তাহাকে দেখা দিয়া যাহা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। সেই বাড়ীতে কাজ, হয়'ত—

সে উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ, খুব পারবো।"

মোহিত বলিল, "পারবি ? তা হলে আসছে বুধবার থেকেই

বেরুতে আরম্ভ করবি—পুরুতমশাই বলছিলেন, মঙ্গলে ঊষা বুধে পা ভাল। হাঁ, ভাল কথা, বড় মজাই হয়েছে কাল।” বলিয়া মোহিত খুব এক চোট হাসিয়া লইল।

ভূতনাথ তাহার হাসি দেখিয়া শঙ্কিত হইল। এতক্ষণ তাহাকে দেখিয়া যে ভয়টা হইয়াছিল, তাহার কথা শুনিবার পর সে ভয়টা দূর হইয়াছিল। কিন্তু আবার হঠাৎ গত কল্যের মজার কথা বলে কি? ভূতনাথের বুকটা গুরু গুরু করিয়া উঠিল, গাড়ী থামাইতে বলিবে না কি! না, এক লম্ফে—

মোহিত কিন্তু সমান বলিয়া যাইতে লাগিল, “ওঃ সে যে রগড়, তোকে আর কি বোলবো ভাই। ঐ যে পুরুত মশাইয়ের ভাইপোর কথা বলছিলুম, খুড়ো না এলে আমাদের বাড়ী পূজো করতে আসে, ওকে আমাদের বাড়ীর সবাই চেনে। কাল বিকেলে লতি আমায় খুঁজতে আমার দোতালায় বৈটকখানায় গিয়েছিল।” ভূতনাথ বলিল, “লতি কে?” মোহিত বলিল, “আমার বোন লতিরে। হাঁ, তারপর শোন। দোতালার বৈঠকখানায় নেহাৎ জানাশুনো লোক না হলে উঠতে পায় না, একথা সে জানত। বিশেষ আমি যে ঘরে ছিলুম না, তা সে জানতো না, আর বৈঠকখানায় কারও গলার সাড়াও সে পায় নি। তাই ভাবলে আমি হয়ত অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘরে পা দিয়েই দেখে সোফায় নামাবলি গায় দিয়ে পুরুতমশায়ের ভাইপো। শুনেছিল, কদিন চাকরীটার জন্যে হাঁটাহাঁটি করছে, তাই হয় ত আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওকে এরা সবাই বিষ্ণুপ্রিয়া’ বলে ঠাট্টা করে। আমাদের বাড়ীতে পূজোয় একবার ওদের পাড়ার সখের থিয়েটার হয়েছিলো—ও তাতে চৈতন্যলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া সেজেছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করবার পর বিষ্ণুপ্রিয়া চৈতন্যকে ভয় দেখিয়ে রেগে গিয়ে বলে-

ছিল, 'কৃষ্ণনাম খৃষ্ট হবে, মাতাইবো ধরা স্বরা আনি।" ও ছোকরার আধখানা বলবার পর বাকীটা আটকে গেল—কিছুতেই বেরোয় না, শেষে প্রমটার উইংসের পাশ থেকে চেঁচিয়ে আধখানা বলে দিলে—"মাতাইব ধরা স্বরা আনি।" সেই অবধি বাড়ীর সবাই ওকে ঐ কথাটা বলে খেপায়। লতি ওকে পুরুত মশায়ের ভাইপো মনে ক'রে যেমন ঐ কথা বলেছে, আর লোকটা শুনে মুখ ফিরিয়েছে, অমনই লতি দেখে একটা নতুন লোক, মুখখানা তার যেন হনুমানের মত,—আর ভোঁ দৌড়! হাঃ হাঃ হাঃ।"

ভূতনাথও বাধ্য হইয়া সেই হাসিতে যোগদান করিল, অবশ্য সেটা দাঁতের হাসি'! সে বলিল, "ভারী মজা হয়েছিল ত! তা সে লোকটা—"

মোহিত বাধা দিয়া বলিল, "বলছি শোননা। লোকটা ধড়িবাজ চোর—তাকে সন্ধানের চেষ্টা করতেই আজ গোয়েন্দা-পুলিসে যাচ্ছি।"

ভূতনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও পুলিস দেখা যাইতেছে কিনা। গাড়ী তখন ধীরে চৌরঙ্গী রোড দিয়া চলিতেছিল। ভূতনাথ দেখিল, মোড়ে মোড়ে লাল পাগড়ী আর লালমুখ সার্জ্জেণ্ট। সে স্বপ্নে দেখিল, যেন চারিদিক হইতে লালপাগড়ী আর লালমুখ সার্জ্জেণ্ট ছুটিয়া আসিতেছে, গাড়ীর সোফারের পাশে সার্জ্জেণ্ট, গাড়ীর চাকায় সার্জ্জেণ্ট, গাড়ীর সীটে তাহার দুই পার্শ্বে দুই-জন সার্জ্জেণ্ট—সে আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

মোহিত বলিল, "এ্যাঁ, কি বল্‌লি? কি চুরি করেছিল? আরে সেও ভারী মজা।"

মোহিত গাড়ী থামাইয়া মাঠে বন্ধুকে লইয়া নামিয়া পড়িল।

এতক্ষণে ভুতনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল—যেন জেলখানা হইতে খোলা বাতাসে আসিল। এখন বিপদের সূত্র মাত্র দেখিলেই লম্বা চরণ যুগল সহায় হইতে পারিবে।

মোহিত একখানা বেঞ্চে বসিল; দুইটা সিগারেট দুই বন্ধু টানিতে লাগিল। মোহিত বলিল, "পুরুত মশাই সন্ধ্যাপুজো সারতে এসে আমাদের গলীতে মোড় ফিরেছেন আর দেখেন, বেটা আমার বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। তিনি হলপ করে বল্‌তে পারেন, শালার গায়ে তখন একখানা নামাবলির মত কি ছিল।"

ভূতনাথের সেই সন্ধ্যার হুহু হাওয়াতেও মাথা ঘামিয়ে উঠিল। সেও কাঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "তাইত হে, শালা ভারী চোর ত!"

মোহিত সবিস্ময়ে বলিল, "চুরীর কথা তুই জানলি কি করে, সে বেটা চুরি করেছে কিনা তাত' কখনও বলিনি।"

ভুতনাথ আমতা আমতা করিয়া বলিল, "এই যে তুমি বলছিলে, চোর।"

মোহিত বলিল, "হাঁ, হাঁ, তা হবে। সত্যিই বেটা চোর বটে। যাই পুরুত মশাইকে দেখেছে, অমনই বগলদাবা থেকে কি বার করে তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়ে হন্ হন্ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পুরুত-মশাই স্পষ্ট দেখেছেন সেখানা সিল্কের চাদর।"

ভূতনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "এঁ্যা, সিল্কের চাদর? উঃ বেটা ধড়ীবাজ চোরত।"

মোহিত বলিল, "চোর নয়? পুরুত মশাই বলেন, সে শালা দাগী চোর। কালই দুকুরবেলা পুরুতমশাই গেছলেন, গঙ্গাচান করতে। তাঁর নামবলিখানা চুরি যায় ঘাটে। ঐ শালাই তাঁর নামাবলিখানা চুরি করে ভেগেছে, কেন না পুরুতমশায়ের বোধ হ'ল তার গায়ে তাঁরই মত

নামাবলি খানা দেখেছিলেন।"

ভূতনাথ বলিল, "এঁ্যা, পুরুতের নামাবলি? বল কি? বল কি? মহাপাতক।"

মোহিত বলিল,"তারপর আরও শোন্। আমার ঘর থেকে আমার সিল্কের চাদর জামা আর সোনার বোতামটাও উড়ে গেল! পুরুতমশাই শালার গায়ে সেই সিল্কের চাদরখানাও দেখেছিলেন ব'লে মনে হ'ল। বল্‌দিকি, শালাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া যায় কি না।"

ভূতনাথ বলিল, "পুলিশে দেওয়া? শালাকে পাশ পেড়ে কাটলেও রাগ যায় না। বল কি, বেটার বুকের পাটাখানা কি বল দিকি!"

মোহিত বলিল, "তবে চলনা, দু'জনে বিডন্ ষ্ট্রীটের থানায় যাই।"

মোহিত যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভূতনাথের মুখখানা আবার শুকাইয়া উঠিল। সে আমতা আমতা করিয়া কহিল "তুমিই যাও ভাই। আজ পিসীমার শরীরটে খারাপ হয়েছে, সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে হবে।"

মোহিত বলিল, "তা যাচ্ছি বেটা পালাবে কোথায়? পুরুতমশাই তাকে বেশ করে চিনে রেখেছেন—মতিও তার হনুমানের মত মুখখানা ভুলবে না। কত ধানে কত চাল বাছাধনকে বোঝাচ্ছি আমি—যত টাকা লাগে, পুলিশকে দোবো। উঃ বেটা ঘর সন্ধানী, না হ'লে পুরুত-মশায়ের ভাইপো সেজে আমার বাড়ী উঠলো কি ক'রে? কি বলিস?"

ভূতনাথ দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিল, "ঘরসন্ধানী ব'লে ঘরসন্ধানী! তা ভাই আগে যাই।"

মোহিত বলিল, "এই নে একটা টাকা, গাড়ী ক'রে বাড়ী যাস, আমি কিডষ্ট্রীটটা হয়ে যাব। আর দেখ, কাল সকালে বাড়ী থাকিস, আমার ইঞ্জিনিয়ারের সরকার মশাই তোর সঙ্গে দেখা ক'রে কাজটা

কি করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়ে আসবেন। কেমন ?"

ভূতনাথ বলিল, "হাঁ তাই হবে। তবে এখন আমি যাই ভাই।"

ভূতনাথ উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই হন্ হন্ করিয়া ধর্ম্মতলার দিকে অগ্রসর হইল। সে তখন ভাবিতেছিল, কি ফন্দী আঁটিয়া ইঞ্জিনিয়ারের সরকারটাকে বিদায় করা যায়। পুরুত বেটা তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে, মোহিতের বাড়ী ঘোলঘোড়া দিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেও সেখানে সে আর যাইবে না। তদপেক্ষা তাহাকে সাপের মুখে হাত দিতে বলিলেও ত ভাল!

(৬)

ভোরে উঠিয়াই ভূতনাথ গৃহত্যাগ করিল। যাত্রাকালে পিসীকে বলিয়া গেল, কালীঘাট হইয়া ফিরিবে, আসিয়াই যেন আফিসের ভাত পায়। সে যে বন্ধু মোহিতের ইঞ্জিনিয়ারের সরকারকে সাক্ষাতের সুযোগ দিবে না বলিয়া ভেঁপো হরির আখড়ায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল, পিসীমা অবশ্য তাহা কিছুই জানিলেন না।

সেদিন বেলা ৯টায় যোগের স্নান; কাজেই পিসীমা প্রাতঃস্নানটা মা গঙ্গার জন্য তুলিয়া রাখিয়া খেটেখানা কোমরে জড়াইয়া ভূতোর আফিষের জন্য দুইটা ভাতেভাত চাপাইয়া দিলেন। বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতেই প্রকাণ্ড টাকওয়ালা সরকার মহাশয় হাজির। পিসীমা যখন বলিলেন,সে কালীঘাটে গিয়াছে, ফিরিয়াই আফিষ যাইবে, তখন সরকার মশাই চটিয়াই আগুন। কি রকম লোক ? কথামত কাজ করে না যে, সে কাজ করিবে কিরূপে ? বেচারী অনেক দূর হইতে— সেই শুঁড়ার রাসমণির বাজার হইতে হাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কোনরূপে বপুখানিকে পিসীমার চাঁপাতলার বাটীতে হাজির করাইয়া দিয়াছেন, অথচ তাঁহার মনিবের আদেশে এই ভীষণ শ্রমজনক কর্ত্তব্য পালনের পর

তিনি শুনিলেন কিনা,—বাড়ী নেই, কালীঘাটে গেছে। তাহার অঙ্গ শীতল হোলো আর কি!" তাহার উপর পিসীমা বলিলেন, আহার করিয়া সে আফিষে যাইবে। যে আফিস করিতেছে, সে আবার অন্য চাকুরী করিবে কিরূপে? নাঃ ইহার কিছু ঠিক নাই। সরকার মহাশয় ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

পিসীমা ভুতোর আহার্য্য গুছাইয়া রাখিয়া খেটে, গামছা ও ঘটি লইয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইবেন, এমন সময়ে আর এক স্থূলকায় ভদ্র-লোক উপস্থিত। তিনি পরিচয় দিলেন, তিনি বহুদূর—পশ্চিম দেশ হইতে আসিতেছেন ভূতনাথ বলিয়া একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, সে এই বাড়ীতে থাকে ত? পিসীমা মনে করিলেন, ভ্যালা আপদ! যাত্রাকালে এ আবার কি বাধা! তিনি বলিলেন, সে বাড়ী নাই কালীঘাটে গিয়াছে। ভদ্রলোক ইহাতেও নড়িতে চাহেন না, বেশ কায়েম মোকায়েম হইয়া বাড়ীর রোয়াকে আড্ডা জমাইয়া বসি-লেন। বলিলেন, "তাহ'লে আমি এইখানেই এখন বসি। ভূতনাথ আহার করতে আসবে ত?"

পিসীমা গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, মিথ্যা বলিতে পারেন না, কাজেই বলিলেন, "হঁা, আসবে বৈ কি? কি দরকার বাবু?"

বাবু বলিলেন "না, বিশেষ দরকার কিছু নেই, কেবল দেখতে এসেছি।"

পিসীমা বলিলেন, "তা বোসো বাবু, এলে দেখা কোরো, আমার আবার চানের বেলা হোলো।"

বাবু। আপনিই কি তার পিসীমা? ওঃ তাই বলুন, তাহ'লে শিগ্‌গির যে আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ হ'চ্ছে।

মর! মিন্‌সে বলে কি? তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, বলে কিনা সম্বন্ধ? পাগল নাকি? পিসীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মস্কারা

'করবার আর জায়গা পাওনি বাপু ? উঠে পড় ত এখান থেকে।"

বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলেন কি আপনি ? আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন ? এলুম দিল্লী ভিল্লী হয়ে এক মুল্লুক থেকে আর এক মুল্লুকে—

পিসীমা। আমার বকবার সময় নেই বাবু ! বসতে হয় বোসো, না বসতে হয়, চলে যাও, আমি চানে চললুম। বলে—

বাবু। যাচ্ছেন যান, তবে সেকেলে গিন্নীবান্নী মানুষ, মনে করে ছিলুম, টোটকা টুটকী জানেন, ডাক্তার কবরেজে কিছু করতে পারলে না, তা যদি—

পিসীমা। ওমা, অসুখ হয়েছে ? কি অসুখ বাছা ?

বাবু। অসুখ ব'লে অসুখ ! আহার নাই নিদ্রে নেই, কেবল গা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে—

পিসীমা। ওমা, তা এতক্ষণ বল নি ! তা ঐ গিয়ে ধরনা কেন, হিঞ্চে শাগের রস আধতোলা, মধু—

বাবু। ওসব ঢের করা হয়েছে, তেতো মুখে রোচে না, খেলেই বমি।

পিসীমা। বমি ? তা একটু ক'রে পলতার ঝোল কিংবা নিম বেগুন—

বাবু। ও সবই সমান, কিছু পেটে তলায় না।

পিসীমা। তবে উল্টো চিকিচ্ছে—গুগুলির ঝোল, গুগলির অম্বল, গুগলির চচ্চড়ি। বলে, সারে না ! সেবার হিমির বড় জায়ের সেজ ভায়ের মেজ মেয়ের ছোট ননদের কোলের ছেলেটার ঘুংরি কাসি হয়েছিল,—কোলে চেপে ধ'রে আঙুলে তেল মাখিয়ে গলায় সেঁধিয়ে টেনে তুল্লুম এক দলা কাস ! বস্, ছেলে হাপ ছেড়ে বাঁচলো। রোগ আবার সারে না !

বাবু পিসীমার কথার বানে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া ছিলেন,

তাই বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া শুনিয়াই যাইতেছিলেন। এখন অবসর পাইয়া বলিলেন,—

"আপনি কার রোগের কথা ভাবছিলেন?"

পিসীমা। তুমি কার রোগের কথা বলছিলে বাপু?

বাবু। সেটা বলিনি আগে? ওষুধ ত বাৎলাচ্ছিলেন অনেক—

পিসীমা। তা ব'লে দোবো না? বলে—

বাবু। ওষুধ কি আমার জন্যে ব'লে দিচ্ছিলেন?

পিসীমা। না ত কি আমার জন্যে? তুমি কার রোগের কথা বলছিলে?

বাবু। রূপোর জন্যে?

পিসীমা। তা রূপোই হোক আর সোণাই হোক্, ওষুধ ডাগর মানুষদের একই।

বাবু! আজ্ঞে, রূপো! রূপো! রূপো ডাগর ছেড়ে খাটো মানুষও নয় যে!

পিসীমা। তা না হোক মাঝারি মানুষ হ'লেও চলে।

বাবু। আরে বলছি, মানুষই নয়—

পিসীমা। তবে কি? মেয়ে মানুষ?

বাবু। আরে না, না, রূপো আমার মটক বাঁদর—ঐ যাকে রেলভাড়া দিয়ে এক মুলুক থেকে—

পিসীমা। মর, মর, হতচ্ছাড়া মিনসে! যাচ্ছি শুভকর্ম্মে—

পিসীমা রাগে রাগে গরগর করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন। বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বলি শুনুন, শুনুন—"

পিসীমা দূর হইতে বলিলেন, "দূর, দূর"

বাবু মন মরা হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি নাছাড়বান্দা,

ভূতনাথের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইবেন না। পথে লোকচলাচল হইতেছে, তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। জামার পকেট হইতে মোটা বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিলেন। ধূমপানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাণ্ড ভুড়িওয়ালা দেহ রোয়াকের উপর এলাইয়া পড়িল, তিনি তন্দ্রালসনয়নে শুইয়া পড়িয়া নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিলেন। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইল, কেহ বা ছোট ছোট কাঁকর কুড়াইয়া ভুড়িটা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিল। কর্ত্তার কিন্তু তাহাতে তন্দ্রাব ব্যাঘাত হইল না।

ইতিমধ্যে ভূতনাথ গলির পথে হাজির হইল। সে ভাবিয়াছিল, সরকার বেটা এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। তাই সে আড্ডায় দুই চার ছিলিম পুড়াইয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দূর হইতে সে দেখিল, তাহাদের রোয়াকের উপর একরাশ ভুঁড়ী! একবার উঠিতেছে, আরবার পড়িতেছে, যেন সমুদ্রের বুকে জাহাজ চলিতেছে! সে ভাবিল সরকার বেটা এখনও যায় নাই; তখনই সে পশ্চাতে দুই পা হটিয়া গেল। একবার মনে করিল, চোঁ চাঁ দৌড়ে ভেপো হরির আখড়ায় পলায়ন করে, আবার ভাবিল, না, সরাসরি উহার মুখের উপরই বলিয়া দিবে, সে কুলীর সর্দ্দারী চাকরী করিবে না। শেষ সঙ্কল্পটারই জয় হইল।

পাড়ার একটা ছেলের হাত হইতে একটা ছড়ি কাড়িয়া লইয়া ভূতনাথ তন্দ্রাগত আগন্তুকের ভুঁড়ীতে খোঁচা মারিল। আগন্তুক "ওঁক" করিয়া উঠিয়া বসিলেন। বস্তুতঃ তিনি নিদ্রিত হয়েন নাই, সামান্য একটু আলস্য বা তন্দ্রা আসিয়া ছিল মাত্র। ভূতনাথ তাঁহাকে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল "কিহে বুড়ো ইয়ার! তোফা আরাম করে ঘুমুচ্ছো যে! বলি ব্যাওরাখানা কি কও ত।"

ভদ্রলোক রুষ্টস্বরে বলিলেন, "তুমি ত বড় বেয়াদপ ছোকরা হে—কেহে তুমি ?"

ভূত। আমি বেয়াদপ, না তুমি? আমার রোয়াকে শুয়ে আমাকে—

ভদ্রলোক কথাটা শুনিয়া উঠিয়া বসিলেন, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোয়াক ? তোমার নাম কি শুনি ?"

ভূতনাথ বলিল, "কেন, বিশ্বাস হ'ল না ? আমার নাম ভূতনাথ।

ভদ্রলোক। ভূতনাথ? তুমিই ভূতনাথ? এঁ্যা, এমন বেয়াদপ ছেলেকে পছন্দ করতে পাঠিয়ে ছিল—

ভূত। ওঃ পছন্দ না হ'ল ত বয়েই গেল! আস্তে আস্তে সরে পড় বলছি, নইলে ভাল হবে না।

ভদ্রলোক। এঁ্যা তুমিই আবার মানুষ হবে, কাজকম্মো করবে—

ভূত। কে তোমার কাজকম্মো কত্তে চায় ? সরে পড় না বাবা।

ভদ্রলোক। সরে ত পড়বোই। ভদ্রলোকের মান রেখে কথা কইতে জানে না, এর চেয়ে আমার রূপো যে লক্ষগুণে ভাল।

ভূত। লক্ষগুণে ভাল, কি কোটিগুণে ভাল, সে তুমি বোঝ গে, আমার রোয়াক ছেড়ে চলে যাও, আমি তোমার পছন্দ চাই না।

ভদ্রলোক। চাও না ? তবে হাজারী সরকার সাধাসাধি ক'রে এখানে এলে তোমায় একবার দেখে যেতে কাকুতিমিনতি করলে কেন ?

ভূতনাথ বিস্মিত হইল, বলিল, "হাজারী সরকার ? কে হাজারী সরকার ?"

ভদ্রলোক বলিলেন, "আকাশ থেকে পড়লে যে হে ? কে হাজারী সরকার !—তোমার ভগিনীপতি হে।"

ভূত। মিরাটের হাজারী সরকার?

ভদ্রলোক তখন জুতা পরিধান করিতেছিলেন। লাঠিটা লইয়া প্রস্থান করিবার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হাঁহে ছোকরা—সে-ই ত আমায় বলে দিয়েছিল কলকাতায় এসে তোমায় দেখে যেতে। আমার মেয়ের বিবাহের চেষ্টা করছি কি না,—"

ভূতনাথ আর নাই! এ্যা, ইনি তাহা হইলে সরকার টরকার নহে, মিরাটের কনের বাপ! কি সর্ব্বনাশ!

হাতে হাত কচলাইতে কচলাইতে ভূতনাথ মিনতির সুরে বলিল, "আপনি, আপনি রমানাথ বাবু?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "লোকে ত বলে তাই। হাজারী সরকার ছেলে দেখালে ভাল। তা এখন যাই, তুমি বাবু পিসীর আচল-জোড়া হয়ে বেঁচে থাক, আমার কোন আপত্তি নাই। যেমন পিসী, তেমনই ছেলে!"

রমানাথ বাবু দুইপদ অগ্রসর হইলেন। ভূতনাথ কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া রহিল। মোহিতের বাড়ীর বিদ্যুতের আলোক তাহার অদৃষ্টে ত জুটিতই না, মাঝে হইতে গৃহস্থ রমানাথের প্রদীপের আলোকও তাহার ফস্কাইয়া গেল। হায় পিসী!

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

—কয়াসা-প্রভাত—

অভ্র আভা রূপ্‌লী চাদর

কে দিলরে পরিয়ে তোরে ?

ও বন, তোমায় কাহার আদর

সাজিয়ে দিল এমন ক'রে ?

পাতায় পাতায় মুক্তা আঁকা

স্বচ্ছ বসন মাণিক মাখা

নগ্ন তনুর অমল শোভা

উথ্‌লে ওঠে ভুবন ভ'রে।

অভ্র আভা রূপ্‌লী চাদর

কে দিলরে পরিয়ে তোরে ?

কোন বিরাগে, নয়ন আগে

ওড়্‌না ওড়াও মুখটী ছেয়ে

কার অনুরাগ. ও বন-ভাগ

ক'র্‌লে তোমায় দুষ্টু মেয়ে ?

তাই কুয়াশার আব্‌ছায়াতে

দিন করো রাত কোন মায়াতে

সরম ভ'রে গোপন্‌ র'য়ে

ওই উঁকিতে দেখ্‌ছ চেয়ে!

কোন বিরাগে, নয়ন আগে

ওড়্‌না ওড়াও মুখটী ছেয়ে ?

শ্রীলীলা দেবী।

-অশ্রুজলের পদ্ম—

*

*   *

কিছু দিন ধরে' অজীর্ণ রোগে ভুগে' অনন্ত বাবুর শরীর ক্রমশঃই খারাপ হয়ে আসছিল। প্রৌঢ়ত্বের সীমা ছাড়িয়ে এলেও এতদিন তাঁর শরীর বেশ ভালই ছিল; কিন্তু যেদিন থেকে তাঁর স্ত্রী, স্বামী ও একমাত্র মেয়ে সুজাতাকে রেখে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে অজ্ঞাত লোকে প্রস্থান করলেন, সেদিন থেকে তাঁর শরীরের ওপর যেন শনির দৃষ্টি পড়ল। প্রথম কিছুদিন শুধু জ্বর, পরে সর্দি কাসী ও বুকজ্বলা সুরু হয়ে' ক্রমে তা' অজীর্ণ রোগে পর্য্যবসিত হ'ল। অনন্ত বাবুর সুস্থ ও সবল দেহ শীর্ণ ও নত হয়ে' পড়ল; কাঁচা সোনার মত গায়ের রং ঝরা পাতার মত কালো হয়ে এল, বুদ্ধির আভায় প্রদীপ্ত চোখ দুটি ভোর বেলার চাঁদের মতই হয়ে এল দীপ্তিহীন, ম্লান।

ডাক্তারেরা বায়ু পরিবর্ত্তন করবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। যাই যাই করেও কিন্তু অনন্ত বাবুর যাওয়া আর ঘটছিল না। এর কারণ —পয়সা তাঁর অগাধ থাকলেও বিলাসী তিনি ছিলেন না মোটেই এবং বিলাসীদের মত সুস্থ ও অসুস্থ, উভয়াবস্থাতেই হাওয়া পরিবর্ত্তন করে' তাঁর জীবন কাটেনি। আর এই কারণেই হাওয়া পরিবর্ত্তনের উপ যোগী স্থান গুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ই ছিল না। তাই কোথায় যে যাবেন—এই নিয়েই তিনি মুস্কিলে পড়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিষয় সম্পত্তি দেখবার কি ব্যবস্থা করা যায়—এও একটা মুস্কিল হয়ে

দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল বেঁধেছিল তাঁরই মেয়ে সুজাতাকে নিয়ে'।

অনন্তবাবু রুগ্ন মানুষ; অপরের সাহায্য ভিন্ন এখন আর তাঁর একদণ্ডও চলে' না। যেখানেই থাকুন না কেন—একজন পার্শ্বচরের এখন তাঁর সর্ব্বদাই প্রয়োজন। বায়ু পরিবর্ত্তন করতে গেলে সুজাতাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। সেবার জন্য তো বটেই, তাছাড়া সুজাতাকে কার কাছেই বা তিনি রেখে যাবেন! অথচ সুজাতা যদি রুগ্ন পিতার সঙ্গ গ্রহণ করে' তা' হ'লে তার পড়া শোনার ক্ষতি হবে প্রচুর। আর দু' মাস পরেই তাকে ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দিতে হ'বে। রুগ্ন পিতাকে নিয়ে এতদিন পড়া শোনা করবার তার একটুও অবসর হয়নি, পরীক্ষার পূর্ব্বেও যদি অন্ততঃ কিছুদিন সে পড়বার সুযোগ না পায়—তা' হ'লে এ বছর পরীক্ষা দেওয়া তার সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে' ওঠে।

বিকাল বেলা। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে। ওপরের বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় অনন্ত বাবু তন্দ্রাচ্ছন্নের মত চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন; তাঁর পাশে একখানি চেয়ারে বসে' সুজাতা ধীরে ধীরে পিতার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার যৌবন-জাগ্রত তনু বল্লরী ঘিরে' শরৎ আকাশের মত নীল একখানি শাড়ী; শ্রাবণ মেঘের মত স্নিগ্ধ কালো চুল গুলি পিঠের ওপর মেলানো; পদ্মদলের মত টানাচোখ দু'টি পিতার মুখের দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে আছে। ঝিলি মিলির ফাঁকের ভিতর-দিয়ে-আসা খণ্ড খণ্ড রোদের টুকরোগুলি তার সারা গায়ে আলো-ছায়ার আল্পনা কেটেছে। পড়ন্ত রোদের লাল আভায় তার সুগৌর মুখটি ঈষৎ রাঙা। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছিল তাকে—যেন কবির মানসী, শিল্পীর স্বপ্ন-প্রিয়া।

নীরবে কপালে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে সুজাতা মুখটা একটু নত করে' ডাক্‌লে, বাবা!

অনন্তবাবু নিঝুম হয়ে শুয়েছিলেন—ঘুমোন নি। কন্যার ডাকে সচেতন হয়ে চোখ বুজেই বল্‌লেন,—কি মা? কি বল্‌ছ?

সুজাতা বল্‌লে,—ডাক্তার বাবু কাল বল্‌ছিলেন যত তাড়াতাড়ি চেঞ্জে যাবার বন্দোবস্ত হয় ততই ভাল। তুমি কি কোথাও যাবার ঠিক করেছ বাবা?

চোখ বুজেই শ্রান্ত স্বরে অনন্তবাবু বল্‌লেন, না মা এখনো তো কিছু ঠিক করি নি; তারপর একটু থেমে থেমে বল্‌তে লাগলেন,—তোমাকে রেখে' কোথায়ই বা যাই; তোমাকে নিয়ে গেলেও তোমার পড়া শোনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কি যে করি মা—এই বলে' আপনার মাথার বিপর্য্যস্ত রুক্ষ চুল গুলির মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে লাগলেন। ভাবনা এলেই মাথার চুলের ভিতর আঙুল চালানো ছিল অনন্ত বাবুর চরিত্রগত বিশেষত্ব।

সূর্য্যাস্তের মনোমুগ্ধকর বর্ণচ্ছটা ম্লান হ'য়ে আসছিল। সাম্‌নের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনটি দেশী বিদেশী নানা ফুল গাছে ভর্ত্তি—অগণ্য গাছে অজস্র রকমের ফুল ফুটেছে। মালী গাছগুলিতে জল দিতে সুরু করেছিল। জলে-ভেজা গাছগুলি থেকে একরকম সোঁদা অথচ মিষ্টি গন্ধ আস্‌ছিল। সেই মিষ্টি গন্ধের একটা নিঃশ্বাস টেনে সুজাতা বল্‌লে, নাঃ বাবা। অন্য জায়গায় গেলেও আমার পড়া শোনার কিছু ক্ষতি হবে না। বরং কল্‌কাতার এই হট্টগোলের মধ্যে মনস্থির করে' পড়াই শক্ত। অন্য জায়গায় গেলে তোমার শরীরও সেরে উঠবে আর আমার পড়াশোনাও ভাল হবে বলেই আমার মনে হয়।

সুজাতার কথা শুনে অনন্তবাবু খুসী হ'য়ে উঠলেন। হাওয়া

পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প যে তিনটি সমস্যার জন্যে কার্য্যে পরিণত হ'তে পার ছিল না—সেই সমস্যা এয়ের প্রধানটিরই সমাধান হ'য়ে যাওয়ায় তিনি যেন বেশ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করতে লাগলেন। মুখে বার কতক—আমার এ শরীর গেলেই বা কি থাকলেই বা কি, বললেও তৃপ্তির আভায় যে তাঁর রোগ-শীর্ণ মুখখানি জ্বল্ জ্বল্ করছিল, পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে একথা বুঝতে সুজাতার একটুও দেরী হ'ল না।

অনন্ত বাবুর অবিন্যস্ত চুলগুলি হাত দিয়ে ঠিক করে' দিতে দিতে সে বললে, তা' হ'লে কালই ডাক্তার বাবুকে বলবো বাবা। দেখি উনি কোথায় যেতে বলেন।

সূর্য্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছিল। সুজাতা বারান্দা থেকে অনন্তবাবুকে নিয়ে গিয়ে ঘরে শুইয়ে দিলে। অন্যদিন এমনি সময় রুগ্ন পিতার কাছে বসে' বই পড়া কিম্বা গান শোনানো সুজাতার নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার বন্ধুদের অনেকগুলি চিঠি অনেক দিন হ'ল এসে পড়ে' রয়েছে; সময়াভাবে সেগুলির জবাব দেওয়া হয় নি। চিঠি গুলোর যেমন করেই হোক আজই জবাব লিখে' ফেলবে, এই সঙ্কল্প করে' সুজাতা তার পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সুজাতা অনেকদিন এ ঘরে আসেনি……ধূলো আর জঞ্জালে ঘরটা ভরে' গেছে; টেবিলের বইগুলো এলো মেলো হ'য়ে পড়ে আছে; ছবি গুলোর ওপর মাকড়সা জাল বুনেছে। অনেক দিন পরিষ্কার না করলে ঘরের যেমন রূপ হয়ে থাকে—তেমনি। একদিনে ঘরটি পরিষ্কার করে' ফেলা অসম্ভব মনে হ'লেও সুজাতা দমল না। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, এলানো চুল গুলিতে একটা এলো খোঁপা বেঁধে সে ঘর পরিষ্কার করতে সুরু করে' দিলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরটা বেশ

খানিকটা সাফ হ'য়ে গেল। টেবিলের ওপর ছড়ানো বই গুলি তাদের যথা নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলে; সেল্ফ এর ধূলো পড়া মলিন বই গুলি চক্ চক্ করে' উঠল; ছবির ওপর থেকে ঘর সংসার তুলে মাকড়সার দলও ধীরে বিদায় নিলে। এতক্ষণ ঘরটাকে এক জরা-গ্রস্থ বৃদ্ধের মত কদাকার লাগছিল, এখন মনে হতে লাগল এ যেন বিচিত্রবরণা এক ষোড়শী তরুণী।

ঝাড়া পোঁছা করতে করতে সুজাতা শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। তার ছোট্ট কপালটি মুক্তা বিন্দুর মত শুভ্র ঘর্ম্ম বিন্দুতে ভরে' উঠেছিল। একটু খানি বিশ্রাম নেবার সঙ্কল্প করে' তাই সে পশ্চিম ধারের জান্লার পাশে এসে দাঁড়ালো...জান্লায় দাঁড়াতেই স্নেহময়ী মাতার মত বাতাস এসে তার সর্ব্বাঙ্গ চুম্বন করতে লাগলো। আরাম বোধ করে' মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে অলস দৃষ্টি মেলে সুজাতা রাস্তার দিকে তাকালো। কখন নিঃশব্দে এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। জলে-ভেজা পিচ-মোড়া রাস্তা গ্যাসের আলোয় চক্ চক্ করছে। আকাশে চাঁদ নেই, ছেঁড়া ছেঁড়া কালো মেঘে সারা আকাশ ভরা। অদূরে একটা সুউচ্চ নারকোল গাছ অন্ধকারে দৈত্যের মত আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সুজাতা তন্ময় হ'য়ে বাইরের এই আলো-ছায়াময় রূপটি দেখতে লাগলো। কখন সে তার ঘরের দরজায় অনন্তবাবুর বন্ধু পুত্র শৈবাল এসে দাঁড়িয়েছে তা' সে জান্তেও পারে নি। শৈবালের মেকী কাসীর শব্দে মুখ ফিরিয়ে সুজাতা তাকে দেখতে পেলে। শৈবাল তাদের প্রতিবেশী। অনন্ত বাবুর বন্ধু পুত্র হিসেবে এ বাড়ীতে তার অবাধ গতি। দিনান্তে এক বারও এ বাড়ীতে আসা ছিল তার নিত্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধী ধারী হলেও শৈবাল মোটেই

ভাল ছিল না। সে ছিল ভারী দাম্ভিক, ঈর্ষুক আর পরশ্রী কাতর ; তার সঙ্গলাভ করা মানুষের যেন কত পুণ্যের ফল—এমনিই ছিল তার ধারণা। মনে মনে তার আসা যাওয়া পছন্দ না কর্‌লেও ভদ্রতার খাতিরে অনন্ত বাবু ও সুজাতাকে তা' নীরবেই সহ্য কর্‌তে হ'ত। তার আসা যে এঁদের বিশেষ প্রীতিকর নয়—শৈবাল মনে মনে এ কথা ভালই জান্‌তো। কিন্তু মনে মনে একটা গোপন আশা পোষণ কর্‌তো বলে' তাদের অপছন্দটা সে অবহেলা করেই চলতো।

এ রকম সময় হঠাৎ শৈবালকে দেখবার জন্যে সুজাতা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ধূলা মাখা বেশভূষায় তাই প্রথমটা সে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ল ; কিন্তু পরক্ষণেই কপালে হাত ঠেকিয়ে বেশ সহজ স্বরেই বল্‌লে,—নমস্কার ! প্রতি নমস্কার করে' শৈবাল বল্‌লে, কি করছেন ? সুজাতা হেসে বল্‌লে, ঘরটি নোংরা হ'য়ে উঠেছে তাই পরিষ্কার কর ছিলুম। আপনি বসবার ঘরে একটু বসুন—আমি যাচ্ছি।

আচ্ছা, বলে শৈবাল পাশের বস্‌বার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বস্‌বার ঘরটি বেশ সাজানো। রাফাএল, টিংশিয়ান থেকে সুরু করে, অবনীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত দেশী বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবিতে দেয়াল ভরা ; ঘরটির রং আগাগোড়া স্কাই-ব্লু ; মেঝে একখানি সুচিত্রিত পারস্য গালিচায় মোড়া। টেবিল, চেয়ার, সোফা, কৌচ দিয়ে ঘরটি আধুনিক ফ্যাসানে সাজানো। এক কোণে একটা পিয়ানো এবং ঠিক তার বিপরীত কোণে একটা সুপ্রকাণ্ড কাশ্মিরী বুক সেল্‌ফ। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে নানা বিদেশী কবির রচনাবলী (works) দিয়ে সেল্‌ফটি ভরা।

ঘরে ঢুকতে প্রথমেই সাম্‌নের দেয়ালে চোখ পড়ে। মর্ম্মর-স্বপ্ন তাজমহলের একখানি সুবৃহৎ প্রতিকৃতি সেই দিয়ালকে যুগপৎ সুন্দর

ও পবিত্র করে তুলেছে এবং ঠিক তার পাশেই শোভা পাচ্ছে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের একখানি সুপ্রকাণ্ড তৈলচিত্র। এই দু'খানি ছবি পাশা-পাশি রাখার যে কি অর্থ তা' বোঝা যায় না কিন্তু তবুও দেখ্‌লে পর একটা অননুভূত পূর্ব্ব ভাবে মন ভরে' ওঠে।

সেল্‌ফ থেকে একখানি বই টেনে নিয়ে শৈবাল সুজাতার প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো। প্রতিদিনের বিকেল বেলাটা চা খেয়ে ও গান শুনে শৈবালের এই খানেই কেটে যায়। আজ সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরও তার দেখা না পেয়ে সুজাতা ভেবেছিল আজ আর সে আস্‌বে না। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে আপনার কাজে লেগে গিয়েছিল। হটাৎ কাজের মধ্যে শৈবালের আগমনে সে বিরক্ত হয়ে উঠল: অথচ ভদ্রতার খাতিরে কিছু বল্‌তে না পেরে অপ্রসন্নচিত্তে সে বাথ্‌ রুমে গিয়ে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরে শাড়ীর খস্‌খসানি শব্দে শৈবাল মুখ তুলে চাইলে। সুজাতা ঘরে ঢুক্‌ছে। সবেমাত্র সে গা ধুয়ে এসেছে;···মাথার চুলের ধারগুলো অল্প ভিজে গেছে; একটা গেরুয়া রংয়ের শাড়ী ও সেই রংয়েরই একটা ব্লাউস তার যৌবন-পুষ্পিত কমনীয় তনুকে জড়িয়ে শোভা পাচ্ছে। পদ্মরাগ মণির মত ছোট্ট একটী সিদূরের টিপ তার রক্তিমাভ কপালটির ওপর জল্‌ছে। ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে।

সেল্‌ফ থেকে টেনে-নেওয়া বইখানি থেকে শৈবাল তখন মনে মনে একটী কবিতা পড়ছিল :—

যৌবন রাশি টুটিতে লুটিতে চায়
বসন শাসনে বাঁধিয়া রেখেছে তায়
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

শৈবালের মনে হল যাকে দেখে কবির লেখনী থেকে এই কথাটি বেরিয়ে এসেছিল, সেই বুঝি তার সাম্‌নে মূর্ত্তিমতী হয়ে এসে দাঁড়াল। টেবিলের ওপর বইটা ফেলে শৈবাল বল্‌লে, আসুন, অনন্ত বাবু আজ কেমন আছেন?

সদ্য ফোটা কতকগুলি গোলাপ ফুল কিছুক্ষণ আগে মালী ঘরে রেখে গিয়েছিল। ফুলগুলি একটা জাপানী ফুলদানীতে সাজাতে সাজাতে সুজাতা বললে,—সেই একই রকম। ডাক্তার বাবু বল্‌ছিলেন চেঞ্জে না গেলে এর আর উপশম হবে না। আমরা বোধ হয় শীঘ্রই চেঞ্জে যাব।

শৈবাল বল্‌লে—কবে? আমি তো কিছু শুনিনি।

সুজাতা বল্‌লে,—কবে তা' এখনো ঠিক হয়নি তবে শীঘ্রই।

পাশের ঘরে অনন্তবাবুর গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে সে সচকিত হ'য়ে বল্‌লে'—বাবা উঠেছেন। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন?

নাঃ! রাত্রিতে আর ওঁকে বিরক্ত কর্‌ব না—আমি আজ আসি, নমস্কার! এই বলে শৈবাল উঠে দাঁড়াল। গান শোনা ও চা খাওয়া দুটোর কোনটাই না মেলায় এবং এত সত্বর সুজাতা তাকে বিদায়ের ইঙ্গিত করায় তার মনটা অপ্রসন্নতায় ভরে' উঠেছিল। সিঁড়ী দিয়ে নাম্‌তে নাম্‌তে সে মনে মনে বল্‌লে,—তোমার ও তোমার টাকার লোভেই আমার এ বাড়ীতে আসা। ও বুড়োকে দেখবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। কবে যে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর সুজাতা রাজকুমারী লাভ কর্‌বো!

*
* *

ডাক্তারের পরামর্শ মত ঠিক হ'ল, অনন্তবাবু বায়ু পরিবর্ত্তন করতে দেওঘর যাবেন। জায়গাটা কলকাতা থেকে বেশী দূরেও নয় অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ। যাবার আয়োজন সুরু হল। অনন্তবাবুর চেয়েও সুজাতার উৎসাহ দেখা গেল অনেক বেশী। কারণ বাইরে যাবার সৌভাগ্য সুজাতার জীবনে' কখনো ঘটেনি। ধূম কলঙ্কিত কোলাহল-মুখরিত কলকাতাতেই তার জীবনের উনিশটা বছর একাধিক্রমে কেটে এসেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার সৌভাগ্য বাস্তব জীবনে তার কখনো ঘটে উঠেনি। তাই Sweet is the lore which nature brings কথাটি কার্য্যে পরিণত করিতে তার আনন্দ ও উৎসাহের আর অন্ত রইল না।

সুজাতাদের দেওঘর যাওয়া স্থির শুনে শৈবাল অনন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এল। মাঝের ক'দিন সে আর আসেনি। সুজাতাকে স্ত্রী রূপে পাবার কল্পনা করলেও, অনন্ত বাবু ও সুজাতার দিক থেকে সে এমন কিছু আভাস পায়নি, যাতে তার কল্পনা সফল হতে পারে। তাই সে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং এ বাড়ীতে আসাও কমিয়ে দিয়েছিল অনেক। অথচ একেবারে না এসেও সে থাকতে পারতো না।... অর্দ্ধেক রাজত্ব ও সুজাতা রাজকুমারীর লোভ সে তখনো একেবারে ছাড়তে পারেনি।

বিছনার ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে' অনন্তবাবু হলকেনের একখানি বই পড়ছিলেন। ইংরাজী উপন্যাস পড়া ছিল তাঁর বাতিক। এই অসুস্থ শরীরেও অনেক রাত পর্য্যন্ত তিনি উপন্যাস পড়তেন। অবশ্য সুজাতার সামনে নয়; সে দেখতে পেলেই বই রেখে আলোটি

নিভিয়ে দিত। শৈবালকে দেখতে পেয়ে অনন্তবাবু বই রেখে, তাকে অভ্যর্থনা করলেন ; তারপর বললেন,—এ ক'দিন আসনি যে ? ভাল ছিলে তো ?

শৈবাল বল্‌লে'—এক বন্ধুর দেশে বেড়াতে গিয়েছিলুম তাই আসতে পারিনি। কেমন আছেন আপনি এখন ?

অনন্তবাবু অল্প একটু হেসে বল্‌লেন—যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

সামান্যক্ষণ কথা কয়েই শৈবাল চঞ্চল হয়ে উঠল। তার এ চঞ্চলতার কারণ অনন্তবাবুর জানা ছিল,তাই গলাটা উচু করে তিনি বল্‌লেন, সুজা, শৈবাল এসেছে এক কাপ চা দিয়ে যাওতো মা।

নিকটেই সুজাতা গ্যাসের উনানে পিতার জন্য কি একটা রাঁধছিল, পিতার কথা শুনে সে চায়ের জল বসিয়ে দিলে। উচু টুলের ওপর বসে' রাঁধতে রাঁধতে সে বই পড়তো ; চায়ের জল না ফোটা পর্য্যন্ত একখানি বই নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

চা তৈরী করে নিয়ে সুজাতা যখন ঘরে এসে ঢুক্‌ল, অনন্তবাবু তখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বিছানার ওপর শুয়ে পড়েছেন আর শৈবাল কি একটা বই পড়্‌ছে। শৈবালের সামনে চা ও খাবারের প্লেটটি রেখে সে শুধু বল্‌লে,—নমস্কার।

—ভাল আছেন আপনি ?

—হ্যাঁ ভালই।

শৈবাল যে এ ক'দিন এখানে আসেনি সুজাতা একথা উল্লেখ না করায় সে একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। মুখে কিছু না বলে' শুধু একটু গম্ভীর হয়ে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে তার দৃষ্টি প্রসারিত করে' দিলে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে সুজাতাকে আর সে দেখতে পেলেনা—কখন নিঃশব্দে যে চলে গেছে।

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে' শৈবাল গম্ভীর ভাবে উঠে দাঁড়ালো। এখানে আস্‌বার আগে মনে মনে আজ সে অনেক কিছুই সুজাতাকে বল্‌ইবার জন্যে ঠিক করে এসেছিল। কিন্তু এই অবহেলার খোঁচা চেয়ে তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। সুজাতার সঙ্গে দেখা কর্‌বার চেষ্টা না করে' তাই সে আস্তে আস্তে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

*

* *

পথের ধারের লাল রংয়ের নতুন বাড়ীটি অনেক দিন ধরে ভাড়া দেবার জন্য খালি পড়ে আছে। বাড়ীর ভাড়া বেশী বলেই হোক্‌ কিংবা বাড়ীর সঙ্গে ভৌতিক উপদ্রবের সংস্রব থাকার জন্যেই হোক্‌, আলো হাওয়ার অবাধ গতি থাকা সত্বেও এ বাড়ীতে কেউ ভাড়াটে আসে না। বৎসরের পর বৎসর তাই অনুপভোগ্য থেকেই বাড়ীটির জীবন কাটছে।

দেওঘরে এসে কিন্তু এই বাড়ীটিই অনন্তবাবুর ভারী পছন্দ হওয়ায় এই বাড়ীটাই তিনি ভাড়া নিলেন। যে দু'টো কারণে বাড়ীটিতে এতদিন ধরেও ভাড়াটে আসেনি, সে দু'টো কারণ অনন্তবাবুর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ কর্‌তে পার্‌লে না। টাকার তাঁর ভাবনা ছিল না এবং উপদেবতাকে শ্রদ্ধা করতেও তাঁকে কেউ কখনো দেখেনি।

বাড়ীটির অবস্থিতি ভারী চমৎকার। সাম্‌নে দিগন্তের দিকে ছুটে চলা এঁকা-বেঁকা পথ; কিছু দূরে ধারওয়া নদী ধীরে বয়ে চলেছে...... কে যেন মাটীর ওপর হীরক-চূর্ণ ছড়াতে ছড়াতে কোথায় চলে গিয়েছে। বাড়ীর সাম্‌নে ছোট্ট একটু কম্‌পাউণ্ড—বিদেশী ফুলগাছে ভরা। সকাল ও সন্ধ্যা সেই ফুলের গন্ধে বাড়ীটি মূর্চ্ছার মত অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবির মত সুন্দর, এই বাড়ীটি দেখে সুজাতার ভারী পছন্দ হ'ল। দরোয়ান ও ভৃত্যের সাহায্যে সে তার ছোট্ট সংসারটী মোটামুটি রকম গুছিয়ে তুল্লে। পিতার শোবার ঘরটি সে ঠিক কর্‌লে রাস্তার ধারের ঘরটিতে হবে। এ ঘরে আলো হাওয়া র রাজত্ব, ফুলের গন্ধ এ ঘরে সর্ব্বদাই মাখানো। পাশের ছোট ঘরটি সুজাতা তার পাঠাগার কর্‌বার জন্যে মনোনীত করে নিলে। নতুন দেশে নতুন বাড়ীতে নতুন আব-হাওয়ার মধ্যে এসে পিতা পুত্রীর জীবন-ধারা সুখ-স্বপ্নের মতই উপভোগ্য হয়ে সলীল গতিতে ব'য়ে চল্‌লো।

*

* *

পূর্ণিমার রাত। সারা পৃথিবীর ওপর নিঃশব্দে জ্যোৎস্নার প্লাবন বইছে। আকাশ নির্ম্মেঘ, নীলোজ্জ্বল; বাতাস সুরভি-স্নিগ্ধ; চারধার নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে তুল্‌ছে।

অনন্তবাবু অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। সুজাতাও শয্যা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ঘুম না হওয়ায় ছাদের ওপর এসে সে পায়চারী কর্‌ছিল। বাতাসে মাঝে মাঝে তার মাথার চূর্ণ অলকগুলি মুখের ওপর এসে এসে পড়্‌ছিল, চাঁদের আলোয় কাণের হীরক দুলটা ঝিক্‌ মিক্‌ করে উঠ্‌ছিল। আনমনে সে পায়চারী করে' চলেছে।

হঠাৎ বেহালার উদাস-মধুর সুর-ঝঙ্কার কাণে আস্‌তে সুজাতা বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালো। সাম্‌নে শাদা রংয়ের ছোট্ট একটী বাড়ী —চাঁদের আলোয় শুভ্র স্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। সুজাতার মনে হ'ল বেহালার সুরটা যেন সেই বাড়ী থেকেই ভেসে আস্‌ছে। বুঝি কোন বিরহী তরুণ বাজাচ্ছে! নইলে সুরের মীড়ে হাসি কান্নার এমন

একত্র সমাবেশ কেমন করে সম্ভব হবে। অতীতের মিলন-ঘন দিনগুলি স্মরণ করে বেহালার সুরে হাসির ঝরণার সঙ্গে বিরহের ব্যথা ম্লান দিনগুলির অশ্রুর ঝরণা বয়ে চলেছে।

দিনের আলোয় এই বাড়ীটি অনেকবার সুজাতার চোখে পড়েছে। বাড়ীটি তার ভারী ভাল লাগ্‌তো। সুজাতার কাছে এটা বাড়ী বলে মনে হ'ত না.....এ যেন নিপুণ চিত্র করের আঁকা একখানি ছবি—মাটীর ওপর দাঁড় করানো আছে।

অবসর পেলেই আপনার জানালায় দাঁড়িয়ে সুজাতা এই বাড়ীটির দিকে চেয়ে থাক্‌তো। জান্‌লা দর্‌জা বন্ধ দুধের মত সাদা রংয়ের এই বাড়ীটি তার কাছে এক্‌টা রহস্যময় জগৎ এর মতই ঠেক্‌তো। তার মনে হ'ত বাড়ীটি যেন ঘুমের দেশের রাজকন্যার নীড়......এর ভেতর রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে।

যাকে ভিত্তি করে' সুজাতা তার মনের মধ্যে এক্‌টা কল্পনা জগৎ তৈরী করেছিল হঠাৎ সেই বাড়ী থেকেই বেহালার ঝঙ্কার শুনে সে পরম বিস্ময় অনুভব কর্‌লে। দেওঘরে আসা থেকে আজ পর্য্যন্ত এ বাড়ী বন্ধই দেখে এসেছে; মনুষ্য বাসের কোন চিহ্নই তার চোখে পড়েনি। রাজকন্যার ঘুমন্ত নীড় রাজপুত্রের সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় কখন আবার সম্বিৎ পেল—জান্‌বার জন্যে সে কৌতূহলী হয়ে উঠ্‌ল। বিশেষ চেষ্টা করে তার চোখ পড়ল বাড়ীর বন্ধ দরজা জান্‌লাগুলো সব খোলা আর মাঝে মাঝে ছোট ছেলের কলরব বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। এ ছাড়া আর কিছু সে দেখতে কিংবা শুন্‌তে পেলে না।

বেহালা শুন্‌তে শুন্‌তে সুজাতা মনের মধ্যে কল্পনার জাল বুনে চল্‌লো। হয় তো কোন তরুণ কবি—চাঁদের আলোয় উদাস হয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। হয় তো এক বিপত্নীক প্রৌঢ়—প্রেম-স্বর্গলোকে

সেখানে তার প্রিয়া তার প্রতীক্ষায় আঁখির আলো জেলে বসে আছে… সুরের দূতকে সেখানে পাঠাচ্ছে। হয় তো এক তরুণী—যৌবনের অকারণ সুখে হেলা-ফেলা করে জ্যোৎস্না রাত্রি কাটিয়ে দেবার মতলবে বেহালা নিয়ে বাজাতে বসেছে। হয় তো এক তরুণী বিধবা…বুকের জ্বালা সুরের সুধা ঢেলে স্নিগ্ধ কর্‌ছে।

নিস্তব্ধ রাতের বুকের মধ্য থেকে শুধু কেবল বেহালার ঝঙ্কার উঠছে। সুরের নেশায় সারা পৃথিবী মূর্চ্ছার মত অবশ হয়ে পড়ে আছে। সুরের নেশায় সুজাতার মাথাও রিম ঝিম করে' উঠল। ধীরে ছাদ থেকে নেমে এসে সে বিছনার ওপর লুটিয়ে পড়ল। খোলা জান্‌লার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে… রজনীগন্ধার গন্ধমাখা বাতাস ঘরটিকে মাদকতার মত করে' তুলেছে। অকারণ ব্যথায় সুজাতার চোখ সজল হয়ে এল। সুর সুধা পান কর্‌বার কোন অবসরে দেহ যে কখন ধীরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল—তা' সে জান্‌তেও পার্‌লে না।

* * *

সকাল বেলা। সবেমাত্র সূর্য্য উঠেছে—রোদ তখনো প্রখর হয়ে উঠেনি। ঝিলি মিলির ফাঁকের ভিতর দিয়ে আসা রোদের টুক্‌রো গুলি বারান্দার মেঝে লুটিয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে কে যেন সোনার প্রলেপ মাখিয়ে মাখিয়ে মেঝের ওপর বিচিত্র পরি কল্পনার আল্পনা কেটেছে। নীলার মত স্নিগ্ধ নীল আকাশ স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরা। বিচিত্র কল তান তুলে' পাখীর দল তার বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। নীল পর্দ্দার আড়ালে যে মায়াপুরী লুকিয়ে আছে তারই বুঝি তাদের নিত্য এই অভিযান। ফুলের গন্ধ মাখা ও ফুলের মতই কোমল সকালের হাওয়া বইছে। প্রভাত পৃথিবীর এই আলো ছায়া

ময় রূপটি যেন স্বপ্নলোকের একটু খানি আভাসের মত।

বারান্দায় একখানি আরাম কেদারার ওপর গা মেলে দিয়ে সুজাতা তার Poetry Selectionটী নিয়ে পড়্‌তে বসেছিল। কিন্তু বই তার হাতে থাক্‌লেও বইতে তার চোখ ও মন ছিল না একটুও। স্নিগ্ধ উদাস দৃষ্টি মেলে প্রভাত পৃথিবীর রূপটী সে দু' চোখ ভোরে' পান করে নিচ্ছিল। যে বয়সে মন সব জিনিসের মধ্যেই একটা লাবণ্যের আভাস পায়—সুজাতার এখন সেই বয়স। কাজেই অদূরের জীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ীটা থেকে 'সরু করে' দূরের আগাছা ভরা পোড়ো জমীটার মধ্যেও সে একটা মনোরম মাধুর্য্যের সন্ধান পাচ্ছিল। কোথা থেকে উড়ে আসা একটা পাখী বারান্দায় বসে মধুর স্বরে শীষ দিচ্ছে। মনে হচ্ছিল ও যেন এক তরুণ কবী; প্রভাতের এই অপূর্ব্ব রূপটী ওর যেন ভারী ভাল লেগেছে; হেলা ফেলা করে' সকাল বেলাটা কাটিয়ে দেওয়াই যেন ওর মতলব—তাই বাঁশী নিয়ে বাজাতে বসেছে। আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী কাটবে সকাল বেলা—ওর মনোবীণার তারে এই কথাটিই বুঝি বা আজ ঝঙ্কার তুলেছে।

দেওঘরে আসা অবধি অতি প্রত্যূষে উঠে প্রাতঃ ভ্রমণ করা অনন্ত বাবুর নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। উষালোক ভাল করে' পরিস্ফুট হবার পূর্ব্বেই তিনি প্রাতঃভ্রমণ কর্‌তে বেরিয়ে পড়তেন। প্রতিদিনের মত আজও তেমনি বেরিয়ে ছিলেন কিন্তু অনেক বেলা হওয়া সত্বেও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন না করায় সুজাতা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বইখানি নিয়ে নীচে নেমে এসে পিতার প্রতীক্ষায় সে কম্পাউণ্ডে পায়চারী কর্‌তে লাগল আর মাঝে মাঝে তার তারার মত জল্‌জ্বলে চোখ দুটি তুলে পথের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল কেউ আসছে কিনা।

অনেক বেলা হ'ল; তবুও অনন্ত বাবু ফিরলেন না দেখে সুজাতার উদ্বেগ ক্রমে ভয়ে পরিণত হ'ল। দরোয়ানকে পিতার খোঁজে পাঠাবার সঙ্কল্প করে' সে যেই এগুতে যাবে, এমনি সময় পথের দিকে দিকে তার চোখ পড়ল। সরীসৃপের মত এঁকা বেঁকা পথটি দিগন্তে গিয়ে মিশিয়ে গেছে। অনেকদূরে অনন্ত বাবুকে আসতে দেখা গেল। তিনি একলা ন'ন—তাঁর সঙ্গে একটী তরুণ যুবক আসছে। সুজাতা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে যে, অনন্ত বাবু ঠিক স্বাভাবিকভাবে আসছেন না ...কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছেন আর সেই তরুণ যুবকটি তাঁকে ধরে আছে। সুজাতা ভীত ও বিস্মিত হ'য়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। হাতের বইখানি কখন যে নিঃশব্দে তৃণ-শয্যা গ্রহণ করলে তা' সে জানতেও পারলে না। শরৎ-প্রভাতের মায়াময় রূপটী মুহূর্ত্তেই তার কাছে ঝরাফুলের মত ম্লান হয়ে এল।

অনন্ত বাবু যখন একেবারে বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছেন তখন তাঁর পায়ের দিকে সুজাতার নজর পড়ল। তাঁর বা পায়ে জুতো নেই এবং তা'তে একটা রুমাল বাঁধা; রক্তে রুমালটী লাল হয়ে উঠেছে।

অপরিচিত তরুণ যুবকটী সুজাতাকে লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ নারী কণ্ঠ-ধ্বনি শুনে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। সুজাতা তখন পিতার দিকে চেয়ে ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করছিল, তোমার পায়ে কি হ'ল বাবা?

তরুণ যুবকটি সুজাতার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যৌবনের সোণার কাঠির ছোঁওয়ায় মুকুলিত হয়ে ওঠা তরুণীর কমনীয় যৌবন-শ্রী দেখে তার যেন হঠাৎ নেশা ধরে' গেল।

আশঙ্কা ব্যাকুল হীরার মত জল্‌জলে চোখ, শিশির-সিক্ত পদ্মের মত স্নিগ্ধ পবিত্র মুখখানি, দাঁড়াবার সুন্দর ভঙ্গী, নিঃশ্বাস পতনের তালে তালে দুলে'-ওঠা পরণের নীলাম্বরী শাড়ীখানির শিহরণ দেখতে দেখতে

সে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়্‌ল। তার এই ক্ষণিক তন্ময়তা হঠাৎ ভেঙে গেল অনন্তবাবুর কথার শব্দে। অনন্তবাবু তখন সুজাতাকে বল্‌ছিলেন—আজ বড্ড বেঁচে গেছি মা। অন্ধকারে ভাল দেখ্‌তে পাইনি একখানা পাথরে পা আট্‌কে যাওয়ায় হুমড়ী খেয়ে একেবারে পড়ে গেহ্‌লুম। ভাগ্যিস্ ইনি ছিলেন; নইলে হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে পড়েই থাক্‌তে হ'ত। এই বলে যুবকটির হাতে অল্প চাপ দিয়ে বল্‌লেন,—এই আমার বাড়ী; চলুন—ভিতরে চলুন; আপনি না থাক্‌লে আজ আমার কি হ'ত কে জানে। অনন্তবাবু যুবকটির হাত ধরে' বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তে লাগলেন আর সুজাতা কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে তা'কে অভ্যর্থনা কর্‌তে লাগ্‌লো। এতক্ষণ যুবকটিকে সুজাতা ভাল করে' লক্ষ্য করেনি—পিতাকে নিয়েই সে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। এতক্ষণ পরে যুবকটিকে দেখে তার ভারী ভাল লাগ্‌লো। লম্বা ফর্সা তরুণ যুবা; বয়স তেইশ কিম্বা চব্বিশের বেশী হবে না। মাথায় ধোঁয়ার মত স্নিগ্ধ কালো দীর্ঘ চুল; মুখ-শ্রী তরুণীর আননের মত লাবণ্যমণ্ডিত। পায়ে তার বার্ম্মিস চটী, গায়ে একটা গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের পাঞ্জাবী। আড়ম্বর-হীন সরল বেশভূষা—কিন্তু এতেই তা'কে ভারী চমৎকার মানিয়েছে। চোখ দু'টী যেন কোন স্বপ্নের আভায় জল্‌ জল্‌ কর্‌ছে।

অনন্তবাবু যন্ত্রণা অনুভব করে দাঁড়াতেও পাচ্ছে'ন না এবং যুবকটিকে ছেড়েও দিতে পার্‌ছেন না...তাঁর এই উভয় শঙ্কট লক্ষ্য করে' সুজাতা এগিয়ে গিয়ে পিতার হাত ধরলে। সুজাতার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে অনন্তবাবু বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন ও সুজাতা ও অনন্তবাবুর যুক্ত আহ্বানে যুবকটি ধীরে তাদের অনুসরণ করে'চল্‌লো। কেবলমাত্র আহত অনন্তবাবুকে বাড়ী পৌছে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে এলেও যুবকের সঙ্কল্প অটুট রইল না। অনন্তবাবুর সাদর আহ্বান প্রত্যাখান করে' বাড়ীর সাম্‌নে

থেকে ফিরে যাওয়া শুধু অশোভন নয় ভদ্রতা-বিরুদ্ধ। এ ছাড়া চির-রহস্যময়ী নারীর পরিচয় জান্‌তেও তার কৌতূহল হচ্ছিল। তাই সে নিঃশব্দে অনন্তবাবু ও সুজাতার অনুসরণই কর্‌লে।

সিঁড়ী দিয়ে উঠেই খানিকটা খোলা বারান্দা টেবিল আর চিয়ার দিয়ে সাজানো। কম্পাউণ্ডের ফুলগাছগুলির শোভা উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে প্রতি সকালে এই খানে বসে অনন্তবাবু চা-পান করেন। অনন্ত বাবু এখানেই বস্‌লেন; তাঁর অনুরোধে যুবকটিও তাঁর পাশে আসন গ্রহণ কর্‌লে। সুজাতা ভেস্‌লিন আর একখণ্ড পরিষ্কার ন্যাক্‌ড়া দিয়ে অনন্তবাবুর পায়ের ক্ষতস্থানটি ভাল করে বেঁধে দিতে লাগ্‌লো।

যুবকটির দিকে চেয়ে অনন্তবাবু বল্‌লেন,—তোমার নামটি তো এখনো শুনিনি বাবা!

যুবকটি বিনীত কণ্ঠে বল্‌লে, আমার নাম শ্রীকিশলয় রায়।

—এখান থেকে তোমার বাড়ী কি খুব দূর?

—মোটেই না—ওই আমাদের, বাড়ী, বলে' একটু হেসে কিশলয় সাম্‌নের সেই সাদা রংয়ের ছোট বাড়ীটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌লে।

অনন্তবাবু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন,—ওই বাড়ীটা! কই! এতদিন তো ও বাড়ীতে কাউকে দেখিনি।

—না দেখ্‌বারই কথা; কারণ আমরা সবেমাত্র কাল এসেছি। বাড়ীটা আমাদেরই; আমরা না থাকলে অন্য সময় বাড়ীটা বন্ধই থাকে।

অনন্তবাবু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে চেঁচিয়ে বল্‌লেন,—ওঃ তা' হ'লে তো তুমি আমার প্রতিবেশী। সুজা, কিশলয় বাবুকে চা খাওয়াও—বলে তিনি সুজাতার দিকে চাইলেন।

সুজাতা লীলা-ছন্দ গতিতে ভিতরে প্রস্থান কর্‌লে। ওই সাদা

বাড়ীর রাজপুত্র—তাদেরই বাড়ী...শুনে সে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব কর্‌ছিল।

সুজাতা ভেতরে চায়ের আয়োজন কর্‌তে লাগলো আর বাইরে অনন্তবাবু কিশলয়ের কাছ থেকে একটু একটু করে তার সমস্ত পরিচয় জেনে নিতে লাগ্‌লেন। তারা দু'ভাই। বড় ভাই মলয় ব্যারিষ্টার; তিনি বিবাহিত। কিশলয় এম্ এ পড়ছে, এখনো সে বিবাহ করেনি। প্রতি বছরের শরৎ কালটা তারা দেওঘরে এসে কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনটার মধ্যে বৈচিত্র্য আন্‌বার চেষ্টা করে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই কিশলয়ের সরল বিনীত ব্যবহারে অনন্তবাবু মুগ্ধ হয়ে পড়লেন। ছেলেটিকে তাঁর ভারী ভাল লাগ্‌লো। কথা বল্‌বার একজন সঙ্গী মিলে যাওয়ায় তিনি খুব খুসীও হলেন। প্রতিদিন যাতে কিশলয় এখানে এসে তাঁর বাক্যহীন দিনগুলি বাক্য-সরস করে তোলে...তার জন্যে তাই অনুরোধও কর্‌লেন বার বার।

কিশলয় বল্‌লে,—নিশ্চয়ই। আপনার সাম্‌নে যখন থাকি আর আলাপ যখন হ'ল তখন তো এখানে বারে বারেই আস্‌ব। এখানে আমার বৌদিও এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেলে ওঁর ও আর নিঃসঙ্গ বলে' মনে হবে না।

সুজাতাকে আস্‌তে দেখেই কিশলয় এই কথাটি বল্‌লে। অনন্ত বাবুও সাগ্রহে তার এই কথা অনুমোদন করলেন। সুজাতা চা ঢেলে দিতে লাগল...চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তবাবু ও কিশলয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌লো।

বিদেশের আলাপ অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সুনিবিড় হয়ে ওঠে। অনন্তবাবু ও কিশলয়ের মধ্যেও এই চির-চলিত পন্থার কোন ব্যতিক্রম হল না। ক্রমশঃ যখন প্রকাশ পেল কিশলয় শুধু সুন্দর মাত্র নয়, তার

গুণও সুন্দর—সে চমৎকার কবিতা লিখ্‌তে পারে আর বেহালা ও বাঁশী বাজাতে সে সিদ্ধ হস্ত—তখন অনন্ত বাবু তার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়্‌লেন; আর সুজাতার মনো-মন্দিরে তার উদ্দেশে একটী শ্রদ্ধার ফুল চির তরে নিবেদিত হ'য়ে গেল।

আবার বিকেলে আস্‌বার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিশলয় বাড়ী ফির্‌লো। সাম্‌নেই বাড়ী···ফির্‌তে দু' মিনিটও লাগে না। অকারণ সুখে কিশলয়ের বুক ভরে উঠেছিল, তখনি বাড়ী ফির্‌তে তার ইচ্ছা হ'ল না। গুন্ গুন্ করে' একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নদীর দিকে সে পা চালিয়ে দিলে। নদীর তীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে যখন সে বাড়ী ফির্‌ল...ফুলের মত কোমল রোদ তখন আগুনের মত প্রখর হয়ে উঠেছে এবং তার ফির্‌তে এত বেলা হচ্ছে দেখে তার দাদা ও বৌদি উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছেন।

*

* *

কলেজে Straight Forword বলে' কিশলয় নাম কিনেছিল। কোন কিছু চাঁদা আদায় কিংবা ছুটীর দরখাস্ত নিয়ে প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাওয়া, এ সব বিষয়ে সে ছিল অগ্রণী। প্রফেসর্‌রা তাকে ভাল বাস্‌তো, সতীর্থরা তা'কে শ্রদ্ধা কর্‌তো; বিনিময়ে তাঁর মধুর ব্যবহার সবাইকে তৃপ্তি দিত। ধনীর ছেলে হলেও দাম্ভিকতা ছিল কিশলয়ের সম্পূর্ণ অজানা; সবার সঙ্গে সমান হয়ে মেশবার ক্ষমতা ছিল তার অদ্ভুত।

পিতামাতাকে কিশলয় কিশোর বয়সেই হারিয়েছিল কিন্তু দাদা ও বৌদির স্নেহ যত্নে পিতামাতার অভাব অনুভব কর্‌বার তার সুযোগই ঘটেনি।

অন্যবারের মত এবারেও ইষ্টারের ছুটীতে দেওঘর আসা কিশলয়দের বাদ গেল না। দাদা বৌদি ভাইঝি বেণু আর একরাশ ইংরাজি বাংলা নভেল্ নিয়ে, কলেজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিশলয় দেওঘরে এসে হাজির হ'ল।

কিশলয় ছিল কবি। নামেই নয়, সত্যিই সে ভাল কবিতা লিখতে পার্‌তো। কল্‌কাতায় তার লেখা বেশী এগুতো না; তার উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি সে দেওঘরে বসেই লিখেছে। ছবির মত সুন্দর শঙ্খ-ধবল দেওঘরের এই ছোট্ট বাড়ীটীতে এলে পর—কল্পনা রাণীর কৃপা-রসে তার দেহ মন অভিষিক্ত হয়ে উঠ্‌ত। তাই কোলাহল-মুখরিত ধূম-কলঙ্কিত কল্‌কাতা ছেড়ে অবসর পেলেই দেওঘরে আসবার জন্যে তার মন উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ত।

দেওঘরে এসে কিশলয় অতি প্রত্যুষে প্রাতর্ভ্রমণ করে। এবারে এসেও সে প্রাতর্ভ্রমণ ছাড়লে না। সকালের আলো ভাল করে ফোটেনি, পাখীদের ঘুম ভাঙেনি, আকাশের বুকে তারার বাতি জ্বালানো···এম্‌নি সময় সে বেড়াতে বার হ'ল। সরীসৃপের মত এঁকা বেঁকা পথগুলো চার্‌দিকে ছড়ানো...তার-ই একটা পথ ধরে' কিশলয় নদীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল। অন্ধকার ভাল করে' কেটে না যাওয়ায় পথঘাট ভাল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীরে পৌছিয়ে কিশলয় দেখ্‌লে অত ভোরেও এক প্রৌঢ় নদীর তীরে পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। একেবারে নদীর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছবার উদ্দেশ্যে কিশলয় এগিয়ে চল্‌ল। হঠাৎ এক অস্ফুট আর্ত্তনাদের ধ্বনি কাণে আস্‌তে সে বিস্মিত হয়ে পিছন ফিরে তাকালো। নদীর অসমতল তট-ভূমিতে বড় বড় অনেক পাথর পড়ে আছে। অন্ধকারে একটা পাথরে পা আট্‌কে গিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি পড়ে গেছেন এবং

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করছেন। দ্রুতগতিতে প্রৌঢ়ের কাছে এগিয়ে এসে বিশলয় ভদ্রলোকটিকে টেনে তুললে। পাথরে পা আটকে তাঁর পা কেটে গেছে এবং সেই কাটা থেকে অনর্গল রক্ত-স্রোত বয়ে চলেছে। নদী থেকে জল নিয়ে এসে বিশলয় পায়ের রক্ত ধুইয়ে দিয়ে' পকেট থেকে আপনার রুমালখানি বার করে' সেই ক্ষতের ওপর বেঁধে দিলে। বে-কায়দায় পড়ে' অনন্তবাবুর আঘাত গুরুতর হয়েছিল ; চলতে তিনি কষ্ট বোধ করছিলেন। বিশলয় বললে,—চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি ; আর তো এখন আপনি বেড়াতে পারবেন না!

কিশলয়ের গায়ে ভর দিয়ে অনন্ত বাবু অতি কষ্টে বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগলেন। তিনি এত যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন যে অতখানি দীর্ঘপথ তিনি একটুও কথা বললেন না। অনন্তবাবু তাদেরই বাড়ীর দিকে চলেছেন দেখে কিশলয় কৌতূহল বোধ করছিল ; কিন্তু যন্ত্রণা কাতর প্রৌঢ়কে সে কোন কথা বলতেও পাচ্ছিল না। তাদের বাড়ীর সামনের লাল বাড়ীর এঁরাই যে নব আগন্তুক, কিশলয় একথা বুঝতে পারলে, যখন অনন্তবাবু এই বাড়ীর সামনে এসে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে বললেন,—এই আমাদের বাড়ী।

নারী-কণ্ঠ ধ্বনিতে সামনে চেয়ে কিশলয় সুজাতাকে দেখতে পেলে। নীলাম্বরী শাড়ী পরিহিতা, আধ-ফোটা পদ্ম কলির মত সুন্দর মুখখানি ঘিরে কয়েকটা অবাধ্য অলকগুচ্ছ দুলে-পড়া, যৌবনদীপ্তা তরুণীর কমনীয় কান্তি তার কবি-হৃদয়কে প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করলে। সে মনে মনে বললে,—বাঃ! এ যে সত্যই উপন্যাস হ'ল দেখছি। এক বৃদ্ধ ও তাঁর তরুণী কন্যা ; আর আমার সঙ্গে যেমন ভাবে পরিচয় ঘটছে এতো উপন্যাসকেও হার মানায়।

অনেক বেলায় অনন্তবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আবার আর

এক দফা বেড়িয়ে এসে কিশলয় বাড়ী ফিরে দেখলে, বৌদি প্রীতিকা তাঁর বেণু নামধারিণী অশান্ত মেয়েটিকে শান্ত কর্‌বার উদ্দেশ্যে পিয়ানোর সঙ্গে তাঁর মধুর গলা মিলিয়ে গান গাইছেন—

ডাকিল মোরে জাগার সাথী

প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে

প্রভাত হ'ল নিবিড় রাতি।

কিশলয়ের সাড়া পেয়ে গান থামিয়ে প্রীতিকা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিশলয় তখন দর্‌জার চৌকাটে এসে দাঁড়িয়েছিল; তার দিকে চেয়ে বৌদি বল্‌লেন,—তোমার আজ হয়েছিল কি ঠাকুর পো? এত বেলা পর্য্যন্ত কি কর্‌ছিলে? কখন চা' হয়ে গেছে।

বৌদির সস্নেহ তিরস্কারের উত্তরে কিশলয় বল্‌লে, না বৌদি, চায়ের আর দরকার নেই। চা আমি খেয়ে এসেছি।

প্রীতিকা একটু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন,—কোথায়? দেওঘরে আবার চায়ের দোকান হয়েছে নাকি? দু'হাত দিয়ে বেণুকে কোলে তুলে নিয়ে কিশলয় বৌদির কাছে তার চা খাওয়ার ইতিবৃত্ত বর্ণনা কর্‌লে। বৌদি ভারী আমুদে মানুষ; কিশলয়ের কথা শুনে তিনি সহাস্যে বল্‌লেন,—মানস-লক্ষীর দেখা পেয়েছ তা' হলে! বেশ ভাই বেশ! আমার সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করে দিচ্ছ কবে বল?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে কিশলয় একটু হেসে একখানা আরাম কেদারার ওপর গা মেলে' দিলে।

*

* *

কিছুদিন কেটে গেছে।

দুপুর বেলা। স্নানাহার সম্পন্ন করে' একখানি ইংরাজী উপন্যাস

হাতে নিয়ে কিশলয় বাড়ীর সাম্‌নের Compoundএ এসে বস্‌ল। পড়্‌বার ইচ্ছা নিয়ে এলেও পড়্‌তে ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। তাই হাতে-রাখা মোড়া বই মোড়াই রয়ে গেল; দুপুরের তীব্র রৌদ্র রঞ্জিত গাছ পালার শিহরণ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে নানা কথা ভাব্‌তে লাগলো।

তারা ব্রাহ্ম অনন্তবাবুরা ব্রাহ্মণ। উভয় পরিবারের মধ্যে যে কোন রকম লৌকিক ক্রীয়া চল্‌তে পারে না এ কথা যে কিশলয় জান্‌তো না তা নয় তবুও অনন্তবাবুর কাছে সে সুজাতাকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব করেছিল। তার ধারণা ছিল যিনি মেয়েকে এত বয়স পর্য্যন্তও অবিবাহিতা রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন তার মন বোধ হয় তুচ্ছ জাতির পাঁতির মোহে আর সংস্কারগ্রস্থ হয়ে নেই। উপযুক্তা কন্যার যে একটা দাবী আছে একথা তিনি বোধ হয় নিশ্চয়ই মানবেন। তাই সুজাতার সম্মতি নিয়ে কিশলয় অনন্তবাবুর কাছে সুজাতাকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব করেছিল। অনন্তবাবু মনের মধ্যে যে একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণ—এ কথা তার জানা ছিল না। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল; কিশলয়ের তরুণ জীবনের প্রথম প্রেম-নিবেদন পালা সুরুর প্রথমেই আহত হয়ে ফিরে এল।

কিশলয় তন্ময় হয়ে এই সব কথাই ভাবছে এমনি সময় তার বৌদি প্রীতিকা এসে সাম্‌নে দাঁড়ালেন। কিশলয়ের চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন,—চিত্রাকে বিয়ে করবার জন্যে যখন সাধলুম তখন কি না বাবুর বলা হ'ল এখন বিয়ে কর্‌বো না। তিনমাস পরেই এম্‌নি হ'ল যে বাবু একেবারে বিয়ে কর্‌বার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন। বাঃ বাঃ ঠাকুর পো বাঃ!

কিশলয় একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—কেন আমি কি বলিনি মনের

মত Better half পেলে সে কোন মুহূর্ত্তেই আমি বিয়ে করতে পারি।

বৌদি একটু মুচকে হেসে বল্লেন,—সমাজে কি আর মনের মত মেয়ে পাওয়া গেলনা? শেষে কিনা—বৌদির কথায় বাধা দিয়ে কিশলয় একটু তিক্ত স্বরে বল্লে—তুমি Kindly একটু চুপ্ করবে বৌদি? তার স্বরে এমন একটা আর্ত্তধ্বনি প্রকাশিত হ'ল যে প্রীতিকা একটু বিস্মিত হয়ে কথা থামিয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সুজাতার মত মেয়ে যে তাদের সমাজেও দুর্লভ এবং কিশলয়ের নির্ব্বাচন যে মোটেই খারাপ হয় নি—মনের কাছে এ কথা প্রীতিকা স্বীকার না করে পারেনি; শুধু কিশলয়কে একটু রাগিয়ে তোলবার জন্যেই সে এতক্ষণ এই মৌখিক অভিযোগের ভাণ করছিল। কিশলয়কে হঠাৎ এমন বেদনার্ত্ত হয়ে উঠ্তে দেখে প্রীতিকা তার কথা অসমাপ্ত রেখেই ধীরে চলে গেল।

কিশলয় আবার ভাবতে লাগ্লো। এই অল্পদিনেই তার মনোরাজ্যে সুজাতা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে' নিয়েছে; সুজাতার চিত্তপটেও তার ছায়া বোধ হয় একটু বিশেষ ভাবেই পড়েছে। কিশলয় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনির তলায় সে দীর্ঘশ্বাসের ধ্বনি কোথায় তলিয়ে গেল।

*
*　　*

জিনিসপত্র বাঁধা সুরু হয়ে গেছে। কাল সকালের ট্রেণেই অনন্ত বাবু কল্‌কাতায় ফিরবেন। ধর্ম্ম ভীরু বৃদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে পাছে কোন অধর্ম্মের ছায়া এসে পড়ে এই ভয়েই যে কল্‌কাতায় ফিরে যাচ্ছেন আর আর কেউ একথা না জান্‌লেও কিশলয় ও সুজাতার মনের কাছে এ খবরটুকু লুকানো ছিল না।

*
*   *

শুক্লা দ্বাদশীর রাত। চন্দ্রকরোজ্জ্বল ছাদের ওপর সুজাতা আন-মনে পায়চারী করে' বেড়াচ্ছে। চারধার নিঝুম, নিস্তব্ধ; শুধু বাতাসের শন্‌শনানি ও বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি।

কিশলয়ের বাড়ী থেকে হঠাৎ বেহালার করুণ ঝঙ্কার বাতাসে ভেসে এল। অতি করুণ সুরে কে বেহালা বাজাচ্ছে। কোন বিরহিণী তার প্রবাসী প্রিয়ের কথা স্মরণ করে' বিনিদ্র রজনী চোখের জলে ভিজিয়ে দিচ্ছে···এ যেন তারই বুক চাপা রোদন ধ্বনি। যেন কোন সদ্য সাথী-হারা পাখী লতা বিতানের মধ্যে নিদ্রা যাচ্ছিল···হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে সাথীর কথা মনে পড়্‌তে সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। কান্নার মতই করুণ, বিদায়ের মতই ব্যথা ভরা সে সুর ধীরে ধীরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগলো। স্তব্ধ রাত্রি সে সুরের স্পর্শে রিম্‌ঝিম্ করে' উঠল। চলা থামিয়ে সুজাতা ব্যথাতুর নয়নে শঙ্খ-শ্বেত বাড়ীটির দিকে নির্ণিমেষে চেয়ে রইল; তার দু'গাল বেয়ে আস্তে আস্তে জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগলো আর চাঁদের আলোয় সেই জল অভ্ররেণুর মত চিক্‌মিক্ করতে লাগলো। বেহালার সুর যেন কেঁদে কেঁদে বল্‌তে লাগলো

হৃদয় যত নিষেধ হানে নয়ন ততই কাঁদে।
দূরে যতই পলাতে চাই নিকট ততই বাঁধে॥
স্বপন শেষে বিদায় বেলায়
অলক কাহার জড়ায় গো পায়,
বিধুর কপোল স্মরণ আনায়
ভোরের করুণ চাঁদে।

বাহির আমার পিছন হ'ল কাহার চোখের জলে।
স্মরণ ততই বারণ জানায় চরণ যতই চলে।
পার হ'তে চাই মরণ নদী
দাঁড়ায় কে গো দুয়ার রোধি,
আমায়——ওগো বে-দরদী
ফেলিলে কোন ফাঁদে ॥ *

এক টুক্‌রো কালো মেঘে চাঁদের আলো বন্দী হয়ে যেতে সারা' পৃথিবীর ওপর এক্‌টা ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়্‌ল; বাতাস একটু শীতল হ'য়ে এল। বেহালা বাজ্‌তে লাগ্‌ল আর ছাদের আলিসায় দু' হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুজাতার চোখে অবিশ্রান্ত অশ্রু-ধারা বয়ে চল্‌লো।

শ্রীঅমিয়কুমার [illegible]

---

* এই গানটি কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম রচিত।

-শরতের গান-

এই শঙ্খ-ধবল আলোর রেখা
শরত-আকাশে
হৃদয়-ডালি সাজায়ে দেয়
বকুল-পলাশে।

এই শুভ্র-অমল রবির কিরণ
মেঘের গায়ে গলায় হিরণ
অলোক লোকের বারতা সে
বিশ্বে প্রকাশে।

এই শরত আলো নেব আমি
বক্ষে
অরূপ তাঁহার রূপ-মাধুরী
চক্ষে।

এই শরতেরি ফুলের রাশে
শিশির সজল ঘাসে ঘাসে
নৃত্য করি ফেরেন ঠাকুর
আনন্দে উল্লাসে॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

—ভবিতব্য—

বসন্তের মৃদু হিল্লোল থেকে থেকে পল্লীখানার বুকের ওপর শান্তির অমিয় ধারা ঢেলে দিচ্ছিল। গাছে গাছে কোকিলের কুহুতান, ঝোপের আড়ালে দোয়েল, পাপিয়ার কমনীয় কণ্ঠ, চৈত্রের অপরাহ্নটিকে অতি মনোরম করে তুলেছিল। বারোয়ারী তলায় ছেলের দল একটা থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে উঠে পড়ে লেগে গেছে। তারি অন্দরে একটা ভাঙ্গা আটচালায় তক্তাপোষের ওপর বসে নিষ্কর্মা গ্রামবাসীরা তাস, পাসা, দাবা খেলার ফাঁকে মাঝে মাঝে পরনিন্দারূপ সদালাপে মজ্‌লিস গুল্‌জার করে তুল্‌ছিল।

এই সময়ে ঘোষাল বাড়ীর ঘোষাল গৃহিণী কন্যার বিয়ের জন্য পিঁড়ির ওপর আল্‌পনা দিতে লেগে গেছেন। তাঁকে ঘিরে বসেছিল পাড়ার যত অকর্মা কুমারী মেয়েগুলি।

এ বিষয়ে কন্যার নিকট একটু সাহায্য পাবার আশায় ঘোষাল গৃহিণী সাধনাকেও ধরে কাছে বসিয়েছেন। নত মস্তকে নীরবে বসে সে মায়ের আদেশ পালন করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ছোটবোন কুন্তলা এসে তার কানের কাছে অনুচ্চস্বরে বল্‌লে, দিদি বাগানে আস্‌বে, অনেকগুলো ভাল আমের সন্ধান করে এসেছি। কথাটা মায়ের কাণেও পৌঁছে গেল। তিনি কন্যার দিকে ফিরে বল্‌লেন, এই পড়ন্ত রোদে আম বাগানে গিয়ে হৈ চৈ করতে হবে না, যা কাজ কর্চ্ছিস্ কর। কিন্তু রসনা-রুচিকর অপক ডাসা আমগুলির লোভ সম্বরণ

করা সাধনার দুর্ঘট হয়ে উঠলো। করুণ মিনতি পূর্ণস্বরে সে বল্লে—তোমার দু'টী পায়ে পড়ি মা—

সে স্বর মায়ের হৃদয় স্পর্শ কল্লে। আর কদিনই বা মেয়েটির আব্দার সইতে হবে। দু'দিন পরে তো পরের বাড়ী চলে যাবে, আর তো এ আব্দার করতে আসবে না। তাই একটু নরম সুরে তিনি বল্লেন—যা, কিন্তু হুড়োহুড়ি করিস্‌নি।

সাথীদের ডেকে আম বাগানের দিকে অগ্রসর হতে বলে, লগির সন্ধানে সাধনা বা'র বাড়ীর স্কুল ঘরে এসে দেখলে, এই অসময়ে স্কুলের সবচেয়ে যে কয়েকটি দুষ্ট ছাত্র, তাদের স্কুলে ঘরে পাক্‌ড়াও করে তরুণ হেড মাষ্টার শচীনাথ তাদের হাতের লেখা তৈরি করাতে লেগে গেছে। ছেলেরা কেউ বা বেঞ্চির উপর পা ঝুলিয়ে বসে, কেউ বা মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে শ্লেটখানা দেবাক্ষরে ভরিয়ে ফেল্‌ছে। তাদের অদূরে শচীনাথ তার সদা প্রফুল্ল মুখখানিকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করে, একটা অনুচ্চ কেদারার ওপর বসে আছে। দেশের কয়েকজন উৎসাহী বলিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ট গ্রাজুয়েট যুবকের উৎসাহে ও উদ্যোগে সদ্য-স্থাপিত ঘোষাল বাড়ীর এই ক্ষুদ্র স্কুলটির মধ্যে যতগুলি ছাত্র ও ছাত্রী আছে, শচীনাথকে ভয় ও শ্রদ্ধাভক্তি করে না এমন কেউ একজনও নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে সাধনাও ভয় ও শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যে দিয়েই এই শচীনাথের কাছেই পাঠ শেষ করে গেছে। কিন্তু এখন সে শিক্ষা সীমার বাইরে এসে, ভয়পূর্ণ বাধ্য-বাধকতাময় ছাত্রীজীবনের জড়তা-জাল কাটিয়ে ফেলেছে। তাই সে শচীনাথের তখনকার সেই গাম্ভীর্য্যভরা মূর্ত্তিখানাকে আমলে না এনে ঘরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে দ্বার প্রান্ত থেকে ঠুন্ ঠুন শব্দে চুড়ি বাজিয়ে তার চিত্তাকর্ষণ করতে চেষ্টা কল্লে। শচীনাথ তার দিকে চেয়ে দেখলে

তারপর একটু মুচকে হেসে বল্‌লে, কি সাধন, কি চাই।

—ঐ বড় লগিটা নেবো।

দুষ্টুমীর হাসি হেসে শচীনাথ বল্লে, কেমন জব্দ, যাও লগি এখন পাবে না। রোজ বলি না স্কুলঘরে এসব লট বহর রেখনা।

—তোমার দু'টি পায়ে পড়ি শচীদা—

ফের, এখন যাও নইলে এদের মত তোমাকেও জব্দ কর্ব্ব। এই বলে শচীনাথ তার পা টা মেজে ঢুক্‌লে।

সাধনা জানত, এই লোকটা অনায়াসে তাকেও এখনি গ্রেপ্তার করতে পারে। এর অসাধ্য কোন কাজই নেই, এই বেলা সরে পড়াই মঙ্গল। তাই ক্ষুণ্ণচিত্তে সে প্রস্থান কর্লে।

সঙ্গিনীরা তাকে শূন্যহস্তে ফিরতে দেখে বিস্মিত হয়ে বল্‌লে—কই লগি আন্‌লি না? সংক্ষেপে তাদের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে অতি তাচ্ছিল্যভরে সাধনা বল্লে—ভারি ত লগি, নাই বা দিলে। দাঁড়া না একখানা বড় বাঁখারী দিয়ে এখনি একটা লগি তৈরী করে নিচ্ছি। কুন্তি খানিকটা নেকড়ার পাড় আনতো। এই বলে সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিলে।

সাধনাকে নিরাশ করে বিদায় দিয়ে শচীনাথের মনটা বোধ হয় অনুতাপে ভরে উঠেছিল। তাই সে হঠাৎ ছাত্রদের সেদিনকার মত ছুটি দিয়ে স্কুল ঘরের কোণে-রাখা লগিটা হাতে তুলে নিয়ে বাগানের দিকে এগিয়ে গেল।

তখনও সাধনার লগি প্রস্তুত করা শেষ হয়নি। একহাতে বাঁখারি ধরে' অপর হাতে সে বাঁখারিতে ফালী বাঁধছিল। মুক্ত ঘন কুন্তলরাশি মুখের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। তার উপর আগত বিয়ের একটা সলজ্জভাব প্রযুক্ত মুখখানিতে শৈশবের চঞ্চলতা মিশে অতি মধুর

অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল। দূর থেকে একবার তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে লগি হাতে শচীনাথ ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপনীত হ'ল।

প্রতিবাসী হলেও শচীনাথের সঙ্গে ঘোষাল বাড়ীর খুব ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল, এ বাড়ীর যেখানে সেখানে তার অবারিত দ্বার, তা জানা সত্বেও হঠাৎ কোমর বাঁধা অবস্থায় তার সাম্‌নে পড়ে যাওয়ায় সাধনা অত্যন্ত বিরক্তিভরে সবেগে হাতের বাখারিখানা ভূতলে নিক্ষেপ করে, একটা ঝোপের মধ্যে সরে গেল।

কুন্তলা ঝোপের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলো, ত্রস্তে সে কাপড় গুছিয়ে পরছে। সে কৌতুকভরা হাস্যে বল্লে, অত লজ্জা কেন গো, শচীদা কি তোমার বর, এসো না দিদি। এ কথায় সাধনা ক্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এল এবং সজোরে তার গাল টিপে দিয়ে বল্‌লে, আ মরণ লক্ষীছাড়া মেয়ে, কথার ছিরি দেখনা।

বেদনায় কুন্তলা আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

—বল আর বলবি না কখনো ও কথা।

হঠাৎ গালের ওপর টিপুনি খেয়ে কুন্তলার রাগ ধরে' গিয়েছিল। খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দুষ্টামীমাখা হাস্যে অধর রঞ্জিত করে তাই সে বল্‌লে—বল্‌বো—বল্‌বো—বল্‌বো।

——ফের! দাঁড়া দেখাচ্ছি।

গমনোদ্যতা সাধনার গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে শচীনাথ কৌতুক হাস্যভরা গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"ওকে তুমি কিছুতেই টিট করতে পারবে না সাধন। ঝগড়া করে মিছে সময় নষ্ট না করে চল বরঞ্চ আম তলায় যাই আমরা।

দূর থেকে কুন্তলা আবার চেঁচিয়ে বল্‌লে, যাওনা গো, বর ডাকছে—অমন চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

নিষ্ফল ক্রোধে সাধনার মুখ আগুনের মত লাল হয়ে উঠ্‌ল আর কোন্‌ অনাগত দিনের কথা স্মরণ করে' শচীনাথের মুখ ভোরের শুকতারার মতন জল্‌ জল্‌ করতে লাগলো।

(২)

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আম বাগানে ছুটোপাটি করে' শচীনাথ যখন বাড়ী ফিরলো, তখন তার দেহ মন কি যেন এক গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কোথা দিয়ে কেমন করে যে সাধনার চিন্তা তাকে আক্রমণ কল্লে তা সে কোন মতেই বুঝে উঠতে পাল্লে না। ছোটবেলা থেকেই সে সাধনাকে দেখছে। ছোট বোনটির মত কত তাকে আদর যত্ন করে এসেছে কতদিন কত খেলনা দিয়ে, গল্প বলে তার মন ভুলিয়েছে; তার কত আব্দার নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু কোনদিন তো সাধনার চিন্তা তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেনি।

আজ ক্ষণে ক্ষণে সে তার সারা দেহ মনে একটা পুলক-শিহরণ অনুভব করছিল। একটা ছোট্ট বাসনার ঢেউ তার অন্তর সমুদ্রে খেলে যেতে লাগল। একখানি সলজ্জ মুখ গোপনে গোপনে তার প্রাণের তলে যে ধীরে ধীরে নিজের আসন বিস্তার করে নিচ্ছিল, তাকে রোধ করবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তার লোপ পেয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ অনুতাপ ও আত্মগ্লানিতে তার অন্তর ভরে উঠলো,—সেই দিন না সেই তার এক প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে সাধনার বিয়ের সব ঠিকঠাক করে দিয়েছে।

বিকেলে তুলসী মঞ্চের কাছে বসে তারাসুন্দরী হরিনামের মালা জপ্‌ছিলেন, আর নিকটে বসে শচীনাথ দুই একটা বাজেকথা বলে জননীকে অন্যমনা কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছিল। এই সময়ে একখানি

কলাপাতা মোড়া একছড়া কুন্দ ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে সাধনা এসে ধীরস্বরে বল্লে, মাসীমা আমাদের বাগানে অনেক কুঁদ ফুল ফুটেছিল, মা বল্লেন এক ছড়া মালা গেঁথে আপনাদের শ্যাম সুন্দরকে দিয়ে যেতে, তাই দিতে এসেছি। বলে সে পাতা সুদ্ধ মালাটি তুলসী মঞ্চের তলায় রেখে দিলে।

তারাসুন্দরী তাকে নিজের কাছে টেনে বসিয়ে সস্নেহে তার মাথার উপর হাতরেখে স্নিগ্ধস্বরে বল্লেন, শ্যামসুন্দর তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন মা, শুভদিনে তোদের চারটি হাত মিলি॰ ; দন। এই বলে বৃদ্ধা প্রার্থনাপূর্ণ চোখে সুমুখের শ্যামসুন্দরের প্রস্তরময় মূর্ত্তির দিকে ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে চাইলেন। সাধনা লজ্জায় মাথা নত কল্লে।

শচীনাথ ক্ষণেকমাত্র সেই সলজ্জ ও ঈষৎ আনত মুখখানির পানে বিহ্বল নয়নে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে। তারপর সে সেখান থেকে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে, তারাসুন্দরী তার দিকে চেয়ে বল্লেন, এখনি যাস্‌নি শচী, একটু দাঁড়া, শ্যামসুন্দরের গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়ে যাবি, ঐ দিকের আলনায় মটকার কাপড় আছে পরে আয়—এই নে হাতে একটু গঙ্গাজল। শচীনাথ নীরবে মার আদেশ পালন করে ভক্তি-সজল চোখে শ্যামসুন্দরের দিকে চাইলে, —তার মনে হ'ল এ মালা শুধু দেব ভোগ্যের।

সেদিন সাধনা উপরের ঘরে দ্বার প্রান্তে বসে পড়ন্ত রৌদ্রটুকুতে ভিজে চুলের রাশিটি পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে পিছন ফিরে নিবিষ্ট চিত্তে একখানি বই পড়্‌ছিল—হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখলে শচীনাথ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হতে শচীনাথ বলে উঠলো, কদিন ধরে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো মনে

কচ্ছি, তুমি যদি কিছু মনে না কর, তবে বলি সাধন। মাসিমা কোথায় ?

মা ঘাটে, কি কথা বলনা শচীদা।

শচীনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আমার কাছে কিছু লজ্জা কোরনা, আমি তোমায় লজ্জা করবার কেউ নই। তোমার সুখেই আমি সুখী। তোমাকে কিসে সুখী করবো এই আমার ভাবনা। কিসে তোমার ভাল হবে সর্ব্বদাই আমি তাই চিন্তা করি। তুমি যদি বল এ বিয়ে তোমার ঠিক মনের মত হচ্ছে না, তা হ'লে এখনও তোমার এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে পারি। দেখ সাধনা, এখন লজ্জার সময় নয়; স্ত্রীলোকদের পক্ষে এ সময়টা একটু ভেবে দেখা উচিৎ। ইহ জীবনে এ ভুল শোধরাবার আর সময় পাবেনা। এই বলে' শচীনাথ জিজ্ঞাসু নেত্রে সাধনার দিকে তাকালো।

সাধনা এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেলেনা। মাতা-পিতার নির্দ্ধারিত পাত্রকেই যে দেশের কুমারীরা সিংহাসনে বসিয়ে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে থাকে, সে সেই দেশের মেয়ে, সেই পবিত্র হিন্দু কুলের দুহিতা, এতে তার আবার ভুল বা ভাববার কি আছে। সে একটু বিস্মিত হ'য়ে বসে' রইল, কোন উত্তর কল্লে না।

বল সাধনা, আমার কথার উত্তর দাও। তার কণ্ঠস্বরে অবাক' হয়ে সাধনা দেখলে শচীনাথের চোখে মুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠেছে; জীবনে আর কখনো সে তাকে এমন চঞ্চল হ'তে দেখেনি। সে এবার আস্তে আস্তে বল্লে, মা বাবা যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু ভুল ভাবনা আমার মনের মধ্যে নাই, কেন আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ শচীদা ?"

এর পর শচীনাথ যা বলতে এসেছিল তা আর বলা হ'ল না, উচিৎও

নয়। কি ভয়ানক ভুল করে সে প্রাণের তৃষা মেটাতে মরুভূমিতে এসে পড়েছে, এখন ফিরে যাবার উপায় কি? মুখ কালি মাখা করে সেই মুহূর্ত্তে সে সেস্থান পরিত্যাগ করে চলে' গেল।

যথাসময়ে ঘোষালবাড়ীর উঠানে মস্ত একখানা চালা উঠ্‌ল; চালার ভেতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেয়ানের উনান প্রস্তুত হ'ল। অঙ্গনে বাঁশ পোঁতা হ'ল, বৃষ্টি হলে সেখানে সামিয়ানা টাঙ্গান হবে। ঘোষালগিন্নি কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেলেন।

পুরুষমহলে সমস্ত ভার গিয়ে পড়েছে, স্কুলের যত শিক্ষক যুবকবৃন্দের উপর। কেননা সাধনার বাবা ছাড়া আর কোন পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। এঁরাই তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। বিশেষতঃ শচীনাথ—তারি কথায় পরামর্শে এ সংসারের প্রায় সকল কার্য্যই সাধিত হয়। তাই সব চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ভারটা গিয়ে পড়েছিল একা তারি উপর।

কিন্তু এ বিয়ের খাটুনিতে তার তেমন উৎসাহ আগ্রহ নেই। তার মুখে সে কৌতুক পূর্ণ হাসি নেই, কথাবার্ত্তায় সে মনখোলা ভাব নেই। সর্ব্বক্ষণই সে অন্যমনস্ক; কি যেন একটা দারুণ হতাশায় তার অন্তর ম্রিয়মাণ। তার জীবনের মধ্যে এই ভাবটি এই প্রথম বলে সকলের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি থেকে থেকে তার উপর পতিত হচ্ছিল। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কল্লে, সে ম্লান হেসে বল্‌ছিল,—"দিন দিন বয়েস হচ্ছে বইতো কমছে না, চিরকালই কি হৈ চৈ করে কাটাবো?" এর কোন প্রতিবাদ নেই।

(৩)

অতি প্রত্যূষে দুই হাতে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে শচীনাথ বিয়ে-বাড়ীতে এসে দেখলে, ভোরের আলোয় জেগে উঠে সাধনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়েছে। গত দিনের সযত্নরচিত কবরীবন্ধন

নিদ্রার মোহে শিথিল হ'য়ে পিঠের উপর লুটিয়ে পড়েছে। নিমীলিত নয়নযুগলে তখনও নিদ্রার আবেশ ভরে রয়েছে। মুখখানি যেন শরতের প্রথম অভ্যুদয়ে আকাশের মেঘের সমুদয় কালি ধুয়ে ফেলা কনকময়ী উষার মত গোলাপী আভায় ভরা। উভয়ের চোখোচোখি হতে' একটু মৃদু হেসে সাধনা মুখটা নত করলে। আর শচীনাথের মুখের উপর একটা উষ্ণরক্তের ঝলক লেগে গেল। সে অন্যদিকে আর চোখ ফেরাতে পার্লে না, স্তব্ধভাবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সাধনার দিকেই চেয়ে রইল।

এরপর সমস্ত দিনই কেন কে জানে, সাধনার কেবল মনে হচ্ছিল, সত্যই যেন এ বিয়েতে তার সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই। যেন কার নৈরাশ্য পীড়িত ব্যথিত চিত্তের প্রবল দীর্ঘশ্বাসের কুয়াসায় তার আগত এই নবীন জীবন পথের প্রান্ত অবধি আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। এ পথে পা দিলেই তাকে ও যেন আঁকড়ে ধরবে; তার জীবনটাকে দীর্ঘভার যুক্ত করে তুলবে। এমনি একটা সাংঘাতিক আতঙ্ক তার প্রাণের সমস্ত বল শক্তি উদ্যম ও আশাকে ব্লটিং কাগজের মত চুষে নিচ্ছিল।

সন্ধ্যা হলো, চারিদিকে আলো জ্বললো। বাড়ী লোকজনে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। চারিদিকে গোলমাল চেঁচামেচি আরম্ভ হল। সেই সঙ্গে বিয়ের বাড়ীর রোয়াকের ওপর মন-মাতানো সাহানা রাগিণীতে সানাই বেজে উঠলো। সন্ধ্যার সময় বর আসবার কথা। প্রথম রাত্রেই বিয়ের লগ্ন। সকলে উৎব্যস্ত হয়ে বরের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

একজন প্রতিবেশিনী গৃহিণীর আদেশে বোবাগিন্নি কনে নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে কন্যা পিঁড়িতে বসিয়ে দিলেন। বর আসবার সময়

হয়েছে দেখে, শচীনাথ কন্যাকর্ত্তার আদেশে ঘোষাল গিন্নির নিকট থেকে বরের জোড়, চেন ঘড়ি, আংটি প্রভৃতি নিতে এসে গৃহের দ্বার প্রান্ত থেকে হতাশভাবে লালচেলি পরিহিতা সুসজ্জিতা কনের দিকে চাইলে। হায় কেউ কি কখনো কাউকে এমন নিজের বুকের রক্তের মত ভালবাসতে পারে!

হঠাৎ ক্ষীপ্রপদে কন্যাকর্ত্তা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেন। তাঁর হাতে একখানি টেলিগ্রাফ্; ভীত কম্পিত ত্রাসে ঘোষাল গিন্নির নিকটস্থ হ'য়ে বলে উঠলেন—ওগো বড় বিপদ, মহা বিপদ! ! জাত যায়, ধর্ম্ম যায়; এই মাত্র কলকাতা থেকে তার এলো হঠাৎ বরের জ্যাটাইমা মারা গেছে, আজ বিয়ে বন্ধ করতে হবে! সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বলের মত তিনি মেঝের ওপর বসে পড়লেন।

এই সংবাদে বাড়ীর সদর ও অন্দর, উভয়দিকেরই অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠলো। চারিদিকে মহা হৈ চৈ তুমুল কোলাহল বেঁধে গেল। সানাই থেমে গেল। ছাতের উপর কতকগুলি কন্যাযাত্রী সবে মাত্র আহারে বসেছিল, এই গোলমালে তারাও উঠে পড়ল। কেবল মাত্র কোন কথা ছিল না শচীনাথের মুখে। সে কাঠের মত শক্ত ভাবে সেইখানেই দ্বারের কপাট ধরে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে সমস্তদিন ধরেই মনের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করে হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে বড়ই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই ক্লান্ত অবশচিত্তে, সহসা এ কি আশার রাগিণী বেজে উঠলো। সে স্পষ্ট করে' কিছু বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিল না। যখন সে মনের একটা সংশয়ের বেড়াজাল হতে মুক্ত হ'য়ে বুঝলে, তাকে এগিয়ে না গেলে, সহজে এ শঙ্কাপূর্ণ গোলমাল থামবে না এবং মূক প্রস্তর মুর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে জীবনের এই আসন্ন আশাটিকে অবহেলা করলে সব চেয়ে ক্ষতিটা হ'য়ে যাবে কেবল তারি—তখন সে

কোন রকমে কম্পিত পা দুখানিকে কোন রকমে সভাপ্রাঙ্গনে টেনে নিয়ে এসে সকলকে লক্ষ্য করে বললে, ভাববার কোন প্রয়োজন নেই, আমিই এই বিয়ের পাত্র। শুধু আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।

সকলে ক্ষণেক নীরব থেকে তারপর একটু এগিয়ে এসে তার হাত ধরে বিয়ের সভায় নিয়ে গেলো। বাইরে আবার সানাই বেজে উঠল।

শ্রীরাধারাণী ঘোষজায়া।